অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি

ইসলামের আহবান

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি

ইসলামের আহ্বান

www.nagorikpathagar.org

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি
ইসলামের আহ্বান

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ দা'ওয়াহ্ সার্কেল

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ২০১৮

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
মোজাম্মেল হক মজুমদার

গ্রন্থস্বত্ব
বাংলাদেশ দা'ওয়াহ্ সার্কেল

মূল্য
৩০ টাকা মাত্র

www.nagorikpathagar.org

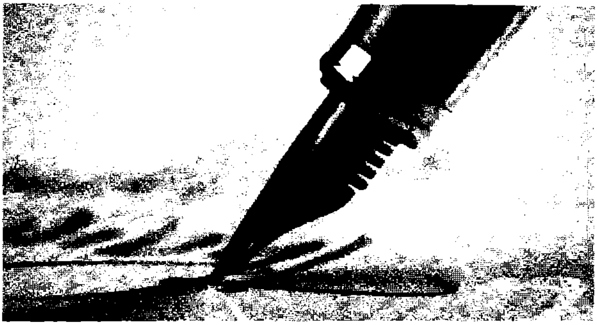

সম্পাদনায়
শাহ্ মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
সদস্য সচিব
বাংলাদেশ দা'ওয়াহ সার্কেল

সম্পাদনা সহযোগী
মোস্তাফিজুর রহমান
শাহীন আহমদ খান
রবিউল ইসলাম
শায়েখ মাহ্ফুজ
মুহাম্মদ নাজমুল হাসান
মুহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন
শহীদ আল মাসুদ
মুহাম্মদ বুরহান উদ্দিন

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ০৬

প্রথম অধ্যায় : ০৮

ধর্মের উৎপত্তি ও বিভিন্নতার কারণ

দ্বিতীয় অধ্যায় : ১২

বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ (ঈশ্বর) সম্পর্কে ধারণা

তৃতীয় অধ্যায় : ২৩

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সমূহ

চতুর্থ অধ্যায় : ৩২

ইসলামে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অধিকার

পঞ্চম অধ্যায় : ৪১

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ইসলামের আহবান

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

মুখবন্ধ

এই মহাবিশ্বের একমাত্র মালিক ও প্রতিপালক হচ্ছেন মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা। তিনি এই বিশ্বজগতের সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য সৃষ্টির একক স্রষ্টা ও মালিক। তিনিই পৃথিবীকে আবাদ করার জন্য অনেক জীব সৃষ্টি করেছেন। যার মধ্যে মানুষকে দিয়েছেন নেতৃত্বের চাবিকাঠি। যুগ যুগ ধরে তাই মানুষ এই পৃথিবীর হাজারো প্রাণীর উপর তার ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রেখে যাচ্ছে। জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত এই মানবজাতিকে মহান আল্লাহ্ দিয়েছেন পৃথিবীর খেলাফতের দায়িত্ব। কিন্তু এই খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করতে এসে নানা সময়ে নানা মত ও পথের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের চির দুশমন শয়তানের প্ররোচনায় তারা অনেক সময় পথ হারিয়ে বিপথগামী হয়েছে। ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই কথা প্রমাণিত হয়েছে যে পৃথিবীতে মানুষের যাত্রা শুরু হয়েছে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। অতঃপর তাদের উভয়ের মাধ্যমেই পৃথিবীর বিস্তৃত অঞ্চলে ছাড়িয়ে পড়েছে হাজার হাজার পুরুষ ও নারী। এভাবেই আজকের পৃথিবী কোটি কোটি মানুষের ভার বহন করে চলছে।

পৃথিবীর কোন মানুষই উদ্দেশ্যহীনভাবে কোন কাজ করে না। এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যে কোন কারণ বা উদ্দেশ্য ছাড়াই তার সময় ব্যয় করে। এটাই প্রাকৃতিক নিয়মও বটে। মহান আল্লাহ্ পৃথিবীতে মানুষকে যে কাজের উদ্দেশ্যে তৈরি করেছেন তা সঠিকভাবে আদায় করার পথ ও পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছেন। সকল যুগ ও জাতির লোকদের কাছে তিনি তার পক্ষ থেকে পয়গম্বর বা পথনির্দেশক পাঠিয়েছেন। যারা আমাদের কাছে পরিচিত হয়েছেন নবী বা রাসূল নামে। এই সকল নবী ও রাসূলগণ সকল যুগেই তাদের স্বজাতির লোকদেরকে সেই দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যার জন্যে তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল। পৃথিবীর বুকে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্যে মহান আল্লাহর পছন্দনীয় নিয়ম এই জাতির কাছে স্মরণ করিয়ে দেয়াই ছিল সেই সকল মহান বার্তা বাহকদের দায়িত্ব। তাদের সে দায়িত্ব পালন করার মধ্য দিয়ে হাজার হাজার পথহারা মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে। এভাবেই ইহকাল ও পরকাল উভয়ের কল্যাণ নিশ্চিত হয়েছে তাদের জন্য। কিন্তু অনেক জাতি তাদের নিকট প্রেরিত নবী ও রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছে, তাদের আনীত

www.nagorikpathagar.org

জীবনবিধানকে তারা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ফলে তারা সঠিক পথ হারিয়ে গোমরাহির সরু রাস্তায় বিপদে আক্রান্ত হয়েছে। তারা নিজেদের খুশিমত আপন চলার পথ তৈরি করে নিয়েছে। জন্ম দিয়েছে নতুন নতুন চেতনাবোধের। আর এই সকল চেতনাবোধের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের ফলে জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন ধর্মের। ফলে পৃথিবীর একই সূত্র থেকে আসা সকল মানুষ বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

পৃথিবীর শুরু থেকেই প্রত্যেক জাতির কাছে যে সকল নবী-রাসূল বা বার্তাবাহক এসেছেন তারা সকলেই এক আল্লাহর পক্ষ থেকে একই বার্তা বহন করেছেন। তারা প্রত্যেকেই এক আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্ষমতার দিকে সকল মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। যেহেতু তারা প্রত্যেকেই এক আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন তাই তাদের সকলের দাওয়াতের বিষয়বস্তুও ছিল এক ও অভিন্ন। আল্লাহর প্রত্যেক বার্তাবাহকই যুগ যুগ ধরে মানবজাতিকে আল্লাহর পছন্দনীয় সেই জীবনব্যবস্থার দিকে ডেকেছেন যা আমাদের কাছে ইসলাম নামে পরিচিত। এককথায় ইসলামই প্রত্যেক যুগে আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম ছিল। প্রত্যেক নবী ও রাসূল ইসলামের দিকেই তার জাতির লোকদেরকে আহবান করেছেন। ঐতিহাসিক এই দাওয়াতের ফলে ইসলাম ধর্মই একমাত্র বিশ্ব ধর্মের মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু বিভিন্ন জাতির লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়ে নানা সময়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। নিজেরাই নিজেদের জন্য তৈরি করে নিয়েছে তাদের আপন ধর্মমত। নিজেদের প্রবৃত্তির চেতনায় তারা এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। অথচ ইসলামই ছিল তাদের একমাত্র অনুসরণীয় ধর্ম, যা পালন করার জন্য তাদের উপর আসমান থেকে নির্দেশনা এসেছে বারবার।

ইসলাম এসেছে প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠীর কাছে। সকল কালের ও সকল স্থানের প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর কাছেই ইসলাম তার দাবি পেশ করেছে। এক আল্লাহর কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করাই ইসলামের আহবান। মৌলিকভাবে তাওহিদের বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরার জন্যই মহান আল্লাহ বিশ্ববাসীকে আহবান করছেন। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় সকল মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য আমাদের কাছে রয়েছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পবিত্র আল কুর'আন ও হাদিসে রাসূল (সা)। বিশ্বের সকল জাতি ও গোষ্ঠীর লোকদের জন্য যেমন পবিত্র আল কুরআনে রয়েছে পথচলার নির্দেশিকা তেমনি রয়েছে মুহাম্মদ (সা) এর জীবন আদর্শ। এই উভয় পাথেয় দ্বারাই উপকৃত হতে পারে পৃথিবীর সকল জনপদের মানুষ।

www.nagorikpathagar.org

আমরা এই বইয়ে প্রধানত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ইসলামের মৌলিক আহ্বান সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা দেখাতে চেয়েছি যে পৃথিবীর প্রধান প্রধান সকল ধর্মেই মহান আল্লাহর একক অস্তিত্ব বর্তমান রয়েছে। বিকৃত হয়ে যাওয়া ধর্মগ্রন্থগুলোর পুরনো পাতায় এখনো আল্লাহর একক অস্তিত্বের সন্ধান মিলছে। যদিও তার অনুসারীরা সে অধ্যায়কে গোপন করার চেষ্টা করছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি কিভাবে পৃথিবীতে নানা ধর্মের বিবর্তন হয়েছে। যদিও পৃথিবীর প্রথম মানুষ ছিলেন নিখাদ ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত একজন নবী তথাপি কালের বিবর্তনে অনেক ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। কিভাবে এই ধর্মগুলো একটি তাওহিদবাদী ধর্ম থেকে বিকৃত হয়ে এই পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি ও ভিন্নতার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামের আত্মপরিচয় পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে সেই সব বিশ্বাসবোধের কথা যার উপর দাঁড়িয়ে আছে ইসলামের প্রাসাদ। সরল ভাষায় পেশ করা হয়েছে সেই সকল বিশ্বাসের আত্মপরিচয় এবং মর্মকথা।

চতুর্থ অধ্যায়ে একজন সাধারণ মানুষ বিশেষ করে একজন অন্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির কাছে ইসলাম যে সকল দাবি পেশ করে তার সারকথা আলোচিত হয়েছে। মোটাদাগে ইসলাম যে সব বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে তার একটি সরল রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে সেই অধিকারের আলোচনা যা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি প্রদান করার ঘোষণা দিয়েছে ইসলাম। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র তার অধীনস্ত অন্য ধর্মাবলম্বী সকল মানুষের জন্য যে সব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে এই অধ্যায়ে।

সর্বোপরি অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের কাছে ইসলামের মৌলিক যে আহ্বান রয়েছে তাকে ভিত্তি করেই যুক্তি ও প্রামাণিক দলিলের অবতারণা করা হয়েছে। আশা করি এই বইটি সত্যের পথে চালিত হতে প্রত্যেক সত্যপ্রেমিক ব্যক্তিকে সহায়তা করবে। এই বইটি যদি আল্লাহর কোন গোলামকে সত্যের দিকে সামান্যতম এগিয়ে আসতে সহায়ক হয় তবে সেটাই হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা। নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বিনিময় কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

ধর্মের উৎপত্তি ও বিভিন্নতার কারণ

মানুষ সৃষ্টির প্রচলিত মতটি হলো, সৃষ্টিকর্তা সর্বপ্রথম একজন মানুষ সৃষ্টি করেন। তারপর সে মানুষটি থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেন। অতঃপর ঐ জোড়ার বংশধারা চালু করেন। শত শত বছর ধরে তা চলতে চলতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীতে যত মানুষ জন্ম নিয়েছে সবাই ঐ প্রথম জোড়াটির সন্তান। সকল জাতির ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা এক বাক্যে এ কথা ঘোষণা করে যে, একজন মানুষ থেকেই মানবজাতির বংশধারার সূচনা হয়। বিজ্ঞানের অনুসন্ধান থেকেও এ কথা প্রমাণ হয়নি যে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার পৃথক পৃথক মানুষ তৈরি করা হয়েছিল। বরং অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক এ ধারণা পোষণ করেন যে, প্রথমে একজন মানুষই জন্মেছিল এবং দুনিয়ায় যত মানুষ পাওয়া যায় তারা সবাই ঐ একজন মানুষেরই সন্তান। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, সকল ধর্মানুসারে প্রথম একজোড়া মানুষ থেকেই মানবজাতির সূচনা। তাহলে সৃষ্টিকর্তা মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকেই কাউকে পথনির্দেশক হিসেবে পাঠিয়েছেন। সেমেটিক ধর্মবিশ্বাসীরা আদম (আ)কেই প্রথম মানুষ ও পথনির্দেশক হিসেবে বিশ্বাস করে। আর প্রথম মানুষের পথনির্দেশক হওয়াটা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সৃষ্টির আদিতে পথনির্দেশক যে সকল শিক্ষা ও প্রত্যাদেশ মানুষের নিকট এনেছেন তা তো পরবর্তী পথনির্দেশক যারা সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক মনোনীত তাদের বিপরীত কোন শিক্ষা হতে পারে না। বরং ঐ আদি শিক্ষার সঙ্গে মিলে যাওয়া উচিত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে।

বিভক্তির সূচনা কিভাবে?

পৃথিবীর বিদ্যমান ধর্মগুলোকে মোটা দাগে সেমেটিক ও নন-সেমেটিক এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। সেমেটিক ধর্ম নামটি নূহ (আ) এর পুত্র শাম থেকে এসেছে। বর্তমান পৃথিবীর ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলামকে সেমেটিক ধর্ম বলা হয়। সেমেটিক ধর্মগুলোর মতে, ধর্মীয় বিশ্বাস বিভিন্ন হওয়ার কারণ হলো আদম (আ) এর সন্তানদের মাঝে যারা ভালো ও সৎ ছিল তারা পিতার নির্দেশিত সরল পথে চলতে থাকে। কিন্তু যারা অসৎ ছিল তারা এ পথ ত্যাগ করে ধীরে ধীরে সব ধরনের অন্যায় ও দুস্কৃতির জন্ম দেয়। কেউ চাঁদ, সূর্য ও তারকার পূজা আবার কেউ নদ-নদীর উপাসনায় মগ্ন হয়। আবার কেউবা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে সৃষ্টিকর্তা থেকে পৃথক ভাবতে থাকে এবং এই প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর পূজা করা

www.nagorikpathagar.org

শুরু করে। তাদের ধারণা ছিল এর ফলে সকল সৃষ্টিকর্তা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবে। এ ধরনের মূর্খতার কারণে শিরক ও মূর্তিপূজার বিভিন্ন ধারার প্রচলন হয়। যার ফলে বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভব হয়।

এছাড়া সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরা ধর্মের উৎপত্তি ও ভিন্নতা ব্যাখ্যা করেছেন সামাজিক বিবর্তনবাদ দ্বারা। তাদের মতে মানুষের জ্ঞানের প্রসারের ফলে ধীরে ধীরে একেশ্বরবাদী চিন্তার উদ্ভব হয়েছে। এই একেশ্বরবাদী ধারণা পুরোপুরি আধুনিক। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থগুলো দেখলে বোঝা যায় পৃথিবীর সকল প্রধান প্রধান ধর্মই মূলত এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টায় বিশ্বাসী সকল ধর্মগ্রন্থ একত্ববাদের কথাই বলে।

বিভিন্ন ধর্মের একত্ববাদে বিশ্বাসের প্রমাণ

হিন্দু ধর্ম :

হিন্দু ধর্মকে বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম বলা হলেও তাদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে এ ধর্মের একেশ্বরবাদিতা দেখা যায়। যেমন :

১. তিনি এক, দ্বিতীয় ছাড়া। (Chandaya উপনিষদ ৬:২:৩)

২. তার মতো কিছুই নেই। (svetasa vatara উপনিষদ ৪:১৯)

৩. তার কোন প্রতিরূপ বা প্রতিমা নেই। (আয়ুর্বেদ ৩২:৩)

৪. বন্ধুগণ, তাকে ছাড়া আর কারো উপাসনা করো না। যিনি একমাত্র ঈশ্বর। (রিগবেদ ৪:১:১)

খ্রিস্ট ধর্ম :

হে ইসরাইলিরা শোন, আমাদের প্রভু ঈশ্বর একক প্রভু (মার্ক ১২:২৯)

ইহুদি ধর্ম :

আমি-ই প্রভু এবং আর কেউ নেই। আমিই ঈশ্বর এবং আমার সদৃশ্য কেউ নেই। (বাইবেল; ইসাইয়াহ ৪৬:৯)

ভিন্নতা কেন?

ধর্মগ্রন্থগুলোর উদ্ধৃতি দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে, সকল ধর্মই একেশ্বরবাদী কিন্তু এদের মধ্যে বিশ্বাসগত, আচার অনুষ্ঠান, আইন বিভিন্ন ক্ষেত্রেই পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য মাঝে মাঝে বড় ধরনের সংঘাতের কারণ হয়েছে। অথচ সকল ধর্মের উৎস একই এবং একেশ্বরবাদী চেতনা বিদ্যমান।

এ প্রসঙ্গে সেমেটিক ধর্মগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। তাদের মতে সৃষ্টির শুরু থেকে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন করে নবী পাঠানো হয়েছে। আর তাদের কাজ ছিল আদম (আ) এর শিক্ষাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়া।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের মতে,

"শুরুতে সব মানুষ একই পথে চলছিল কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় সাথে সাথে মানুষ পরিবর্তিত হয়ে যায়। তারা শয়তানের ধোকায় পড়ে নিজেদের স্রষ্টাকে ভুলে যায় এবং বিভিন্ন ধরেনের পাপ কর্মে জড়িয়ে পড়ে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য পাঠালেন নবী-রাসূল। তাদের সাথে নাজিল করেন সত্য গ্রন্থ যাতে সত্যের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কে ফয়সালা করা যায়। আর মতবিরোধ দেখা যায় কারণ এটা নয় যে, শুরুতে তাদেরকে সত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি, বরং মতবিরোধ তারাই করেছে যাদেরকে সত্যের জ্ঞান দান করা হয়েছিল। তারা সুস্পষ্ট হেদায়াত লাভের পর নিছক এক কারণে সত্যকে ছেড়ে বিভিন্ন পথে পা বাড়িয়েছিল যে তারা নিজেদের মধ্যে যুলুম ও বাড়াবাড়ি করতে যাচ্ছিল" (সূরা বাকারা : ২১৩)।

কুরআনের এ আয়াত স্পষ্ট করে দেয় যে, সকল নবী একত্ববাদের দিকেই ডেকেছিলেন কিন্তু তাঁদের এই শিক্ষা মানুষ ভুলে যায় এবং মনগড়া সব কিছু পালন করে যা নতুন নতুন ধর্মের উদ্ভব ঘটায়।

স্ববিরোধী বিশ্বাস :

ধরা যাক ইহুদি ধর্মের কথা, তারা মূলত একত্ববাদে বিশ্বাসী। কিন্তু তাওরাত ধ্বংস হওয়ার পর উজাইরকে তারা আল্লাহর সন্তান বলে অভিহিত করে। তারা মনে করে তারা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার মনোনীত বিশেষ জাতি। তারা আরো মনে করে যে, ইহুদিদের রূহ আল্লাহর রূহ এর অংশ বিশেষ। এসকল কিছু আসলে একত্ববাদের পরিপন্থী কিন্তু ইহুদি সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুদের দ্বারা সংযুক্ত হওয়া এ সকল বিশ্বাস যা, প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ধর্মের মধ্যে বিশ্বাসগত পার্থক্য সৃষ্টি করেছে।

খ্রিস্টবাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারাও এক স্রষ্টাকে মেনে নিয়েছে কিন্তু তাদের ত্রিত্ববাদ অর্থাৎ পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা তিনে এক। একে তিন এই বিশ্বাস তাদেরকে একত্ববাদের বিপরীত অবস্থানে নিয়ে এসেছে। অপর দিকে ঈসা (আ) যিশু খ্রিস্টকে খোদার পুত্র বানিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে।

হিন্দুধর্মে যদিও একত্ববাদিতার উল্লেখ আছে কিন্তু তাদের বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস একত্ববাদের পরিপন্থী স্ববিরোধী মতবাদে পরিণত করেছে।

এক ঈশ্বরবাদী চিন্তার সমাপ্তি হঠাৎ করে একদিনেই হয়ে যায়নি। পৃথিবীর সহজ সরল মানুষদেরকে আল্লাহর দিক থেকে শয়তানের পথে নেয়ার জন্য যে কাঠখড়ি

www.nagorikpathagar.org

পোড়ানো হয়েছে তার পরিমাণও অনেক। শয়তান আল্লাহর বান্দাদেরকে একত্ববাদ থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্য প্রথম যে পথ বেছে নেয় তা ছিল এই যে, একত্ববাদের বাণী যে সকল মহান পবিত্র পুরুষ (নবী ও রাসূল) প্রচার করতেন তাদেরকেই খোদার মর্যাদা দেয়া।

প্রাচীনকাল থেকে যত ধর্মীয় পথ প্রদর্শকের আগমন ঘটেছে অধিকাংশ পথ প্রদর্শককে অত্যাধিক সম্মান দিতে গিয়ে কাউকে ঈশ্বরের সমতুল্য, কাউকে ঈশ্বরের সহযোগী শক্তি, আবার কাউকে ঈশ্বরের পুত্র বানিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ধর্মকে চূড়ান্ত ভাবে বিকৃত করা হয়েছে। তাদেরকে সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক করে কিছু ধর্মবেত্তা অতিমানবীয় করে তুলতে চেয়েছে। এর ফলে উদ্ভব হয়েছে নতুন নতুন ধর্মীয় মত ও গ্রুপ, যা সেমিটিক ধর্মের বিভিন্নতার পিছনে একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আরো যে সব অন্ধকার পথ ধরে একেশ্বরবাদী মানুষ নানা ধর্মের জালে আটকে গেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো mythology দ্বারা বিকৃতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্রষ্টার পক্ষ থেকে আসা বাণীকে গ্রহণ না করে বিভিন্ন কল্পকাহিনি ও রূপকথা দ্বারা বিভিন্ন জিনিসকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। করা হয়েছে আপন মন ও প্রবৃত্তির উপাসনা। নিজেদের জন্য সাময়িক প্রয়োজন ও চাহিদার ভিত্তিতে নিজেরাই তাদের সুবিধামত বিধান রচনা করেছে। আধ্যাত্মিকতা, ওহি এমনকি আল্লাহ সম্পর্কেও তারা নিজেরাই মনপ্রসূত নানা কল্পকাহিনী তৈরি করে তার অনুসরণ ও প্রচার চালিয়েছে। ফলে তা মানব সমাজের ভিতর প্রচণ্ড বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। এভাবেই এক ধর্মের অনুসারীরা নানা ধর্মে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

ধর্মীয় পণ্ডিতদের আলোচনায় আরো একটি বিষয় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। তারা একথা ঐতিহাসিক দলিল প্রমাণের মাধ্যমে পেশ করেছেন যে মানব ইতিহাসের গোড়ার দিক থেকেই লোকেরা ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য 'মাধ্যম' এর আশ্রয় নিতে থাকে। কিভাবে স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে তা ধর্মগ্রন্থ বাতলে দিলেও মানুষ ঈশ্বরের কাছে পৌছানোর জন্য বিভিন্ন মূর্তি ও অতিপ্রাকৃতিক শক্তির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছে যা একত্ববাদের শিক্ষা থেকে তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এভাবেই মূর্তি এসেছে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে। ফলে অধিকাংশ মানুষ এক ঈশ্বরবাদী চিন্তা ও পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়
বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ (ঈশ্বর) সম্পর্কে ধারণা

মানুষের জীবনধারায় সবচেয়ে পুরাতন ও অনিবার্য বিষয় হলো ধর্ম, মানবজাতির ইতিহাস তাই ধর্মেরই ইতিহাস। প্রাগৈতিহাসিক, ঐতিহাসিক, প্রাচীন বা আধুনিক জীবনে কোন না কোনভাবে ধর্মের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সকল যুগে, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিকাশের সকল স্তরে, পৃথিবীর সকল দেশের মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম স্বমহিমায় বিদ্যমান ছিল। ধর্মকে মানুষের জীবন থেকে কখনোই আলাদা করা যায়নি। পৃথিবীর সকল দেশ ও কালের মানুষ কোন না কোন ধর্মের অনুশীলন করেছে। প্রতিটি ধর্মের মূল বিষয় ছিল অতি প্রাকৃত, অলৌকিক বা অস্বাভাবিক কোন বিষয়ে বিশ্বাস। পৃথিবীর সকল কাল ও দেশের ধর্মসমূহের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিটি ধর্মই কোন না কোনভাবে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। সৃষ্টিকর্তা একজন নাকি একাধিক, তাঁর প্রকৃতি কেমন এ নিয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য থাকলেও সৃষ্টিকর্তা থাকার বিষয়টি সকল ধর্মই মেনে নিয়েছে। তাই সৃষ্টিকর্তা বা অতি প্রাকৃত শক্তির প্রতি বিশ্বাসের ওপরই ধর্মসমূহের মৌলিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।

ধর্ম মূলত মানবীয় অস্তিত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মহাগ্রন্থ আল কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে-"(হে নবী!) আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাব! এসো এমন একটি কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন, তা হলো আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত (উপাসনা) না করি, যেন কোন কিছুকেই তাঁর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত না করি। এবং আমাদের কেউ যেন আল্লাহ ছাড়া কাউকে প্রতিপালক রূপে গ্রহণ না করে; যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমরা বলো, তোমরা সাক্ষী থেকো আমরা অবশ্যই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী!" (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)।

ধর্ম যেমন মানবীয় অস্তিত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ তেমনি স্রষ্টাও সকল ধর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, স্রষ্টার ধারণা, স্বরূপ ও প্রকৃতি বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন রকম। কিন্তু এই ভিন্নতা কি স্রষ্টার মাধ্যমেই করা হয়েছে নাকি আমরা বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা করেছি; সে প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। সকল দৃষ্টিকোণ থেকে একথা প্রমাণিত যে এই ভিন্নতা অবশ্যই আমরা করেছি কারণ এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা একজন। তিনি সারা বিশ্ব- ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, প্রাণিজগৎ,

www.nagorikpathagar.org

উদ্ভিদজগৎ অর্থাৎ সর্বোপরি সকল কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনি যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন, অনুরূপই থাকবেন। আমরা কেউ তাঁকে বলি আল্লাহ, কেউ বলি ঈশ্বর, কেউ ভগবান, কেউ গড, কেউ জেহেবো, আবার কেউ বলি আহুরা মাজদা।

মুসলমানরা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী, হিন্দুরা বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী, খ্রিস্টানরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী আবার দু একটি ধর্ম ঈশ্বরেই বিশ্বাস করে না। তাই আমাদের অধিকাংশের মনে প্রশ্ন জাগে কোন বিশ্বাসটা সঠিক। এর সঠিক উত্তর পাওয়ার জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ থেকে স্রষ্টা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা প্রয়োজন।

হিন্দু ধর্মে 'আল্লাহ' সম্পর্কে ধারণা :

হিন্দু ধর্ম বহুঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী একটি ধর্ম। বস্তুত অধিকাংশ হিন্দুই এ বিশ্বাসের স্যাথে সম্পৃক্ত এবং তারা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। কতেক হিন্দু তিন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, আবার কিছু হিন্দু তেত্রিশ কোটি দেবতায়ও বিশ্বাসী। কিন্তু যারা ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন তারা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী।

হিন্দু ও ইসলাম এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো ঈশ্বর উপলব্ধিতে, সাধারণভাবে হিন্দুরা মনে করে সর্বভূতে ঈশ্বর অর্থাৎ সবকিছুতে ঈশ্বর আছেন। তাই হিন্দুরা গাছ, সূর্য, চন্দ্র, জীবজন্তু এমনকি মানবপ্রজাতির মধ্যেও ঈশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি করে। অপরদিকে মুসলমানরা বা ইসলামের মতে, সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি অর্থাৎ মানুষ, জীব-জন্তু, গাছপালা, সূর্য, চন্দ্র এগুলো সবই আল্লাহর সৃষ্টির নমুনা মাত্র।

হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে স্রষ্টা সম্পর্কে অনেক মিল রয়েছে। এই দিক বিবেচনা করে কুরআনে বলা হয়েছে– "এসো তোমাদের ও আমাদের মধ্যকার একটি অভিন্ন বিষয়ে যা তোমাদের ও আমাদের মাঝে এক, তা হচ্ছে আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবো না" (সূরা-আলে ইমরান : ৬৪)।

স্রষ্টা সম্পর্কে যে সকল বিষয়গুলো ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মাঝে মিল রয়েছে যেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যায় তা নিম্নরূপ :

শ্রীমৎ ভগবতগীতা :

হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থগুলোর মধ্যে শ্রীমৎ ভগবতগীতা অন্যতম। গীতাতে বলা আছে, "ঐ সব লোক যাদের বুদ্ধি মেধা বস্তুতান্ত্রিক ইচ্ছে কর্তৃক আচ্ছন্ন, তারা সাকার ঈশ্বরের অনুগত এবং তারা তাদের প্রকৃতি অনুসারে পূজার একটি নির্দিষ্ট

www.nagorikpathagar.org

নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করে" (ভগবতগীতা-অধ্যায় বা শ্লোক-২০)।
সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যাদের ভিতরে ধর্মীয় জ্ঞান নেই বরং বস্তুবাদী জ্ঞানে জ্ঞানী তারাই পারে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করতে। এখানে সাকার বলতে দেব-দেবীর মূর্তিকে বুঝানো হয়েছে। ঈশ্বর সাকার নয় বরং নিরাকার।

গীতায় আরও বলা হয়েছে,
"ক্ষুদ্র জ্ঞানাধিকারী মূঢ়জনেরাই নিত্য সর্বোত্তম পরমভাবনা জেনে আমাকে মানুষ্য, মৎস্য ও কুর্মাদিভাবপ্রাপ্ত মনে করে (এ সবের পূজা অর্চনা করে)" (গীতা :৭:২৪)।

গীতায় আরও বলা হয়েছে,
"যে আমাকে অনাদি জন্মরহিত এবং সর্বকালের একমাত্র প্রভু হিসেবে স্বীকার করে, সে মানুষ্য সমাজে পাপ থেকে মুক্ত হবে" (গীতা : ১০:৩)।

উপনিষদ :
হিন্দুদের আরেকটি অন্যতম পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে উপনিষদ। উপনিষদে বলা আছে

১. 'একম ইভাদ্বিতীয়ম" অর্থাৎ তিনি এক ও অদ্বিতীয়।' (উপনিষদ ৬:২:১)
২. 'তার কোন পিতা-মাতা নেই, কোন প্রভুও নেই।' (Svetasa vatara উপনিষদ, দ্বিতীয় খণ্ড)
৩. 'তিনি সর্বব্যাপী জ্যোতির্ময় তিনি শরীরের উর্ধ্বে। তিনি পাপ পংকিলতামুক্ত ও পরিশুদ্ধ। তিনি সর্বদর্শী মানব নিয়ন্তা তিনি সর্বোত্তম, স্বয়ং আবির্ভূত। অনন্তকাল স্থায়ী, চিরঞ্জীব। একমাত্র তিনিই সর্বজন আরাধ্য। (ঈশোপনিষদ)'
উপনিষদে ঈশ্বরের পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে – "তাঁর রূপ দেখা যায় না, কেউ তাঁকে চোখে দেখেনি; যারা হৃদয় ও আত্মা দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করে, তাঁর উপস্থিতি অন্তরে অনুভব করে, তারাই অমরত্ব লাভ করে"। (Svetag Vatara উপনিষদ, ৪:২০)

পবিত্র কুরআন উপরোক্ত ধারণাকে নিম্নোক্ত আয়াতে প্রকাশ করে– "দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী সুবিজ্ঞ" (সূরা আল আনয়াম : ১০৩)।

www.nagorikpathagar.org

বেদ :

হিন্দুদের সকল ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ হচ্ছে 'বেদ'। বেদ চারটি। যথা– ঋগবেদ, আয়ুরবেদ, শ্যামবেদ ও অথর্ববেদ। অষ্টম শতকে এর সংকলন লিখিত হয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মুনি ঋষিরা বেদ রচনা করেন। বেদের অপর নাম শ্রুতি। ঋগবেদ হচ্ছে সকল বেদের মধ্যে প্রাচীনতম। হিন্দুরা এটাকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করে।

ঋগবেদে ঈশ্বর সম্পর্কে বলা হয়েছে

১. ঋগবেদে বর্ণিত আছে যে, জ্ঞানী ঋষিগণ এক ঈশ্বরকে বহু নামে ডাকে (ঋগবেদ-১:১৬৪:৪৬)

২. ঋগবেদে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে কমপক্ষে ৩৩টি গুণবাচক নামে উল্লেখ করা হয়েছে। গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর নাম হলো 'ব্রহ্মা' অর্থাৎ 'স্রষ্টা' এ শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হলো 'খালিক'।

ব্রহ্মা সম্পর্কে ঋগবেদে বলা হয়েছে যে,

"ব্রহ্মা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই" (উত্তরায়ন বেদ)।

"হে ব্রহ্মা! পৃথিবী বা স্বর্গে তোমার ন্যায় সত্তা জন্মায়নি। আর জন্মগ্রহণও করবে না" (ঋগবেদ)।

৩. ঋগবেদে আরও বর্ণিত আছে "বন্ধুগণ, তাঁকে ছাড়া আর কাউকে উপাসনা করো না, যিনি একমাত্র ঈশ্বর" (ঋগবেদ ৮:১:১)।

আয়ুর্বেদে ঈশ্বর সম্পর্কে বলা হয়েছে

"তারাই অন্ধকারে প্রবেশ করে যারা প্রাকৃতিক বস্তুর উপাসনা করে; যেমন বায়ু, পানি, আগুন ইত্যাদি, তারা গভীর অন্ধকারে ডুবে যায় –যারা শম্ভূতির উপাসনা করে। শম্ভূতি হলো সৃষ্ট বস্তু যেমন-টেবিল, চেয়ার, প্রতিমা ইত্যাদি" (আয়ুর্বেদ ৪০:৯)।

আয়ুর্বেদে ঈশ্বর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "তার কোন প্রতিরূপ বা প্রতিমা নেই" (আয়ুর্বেদ ৩২:৩)।

আরও বলা হয়েছে, "যেহেতু তিনি কিছু থেকে বা কারো থেকে জন্ম নেননি। তাই তিনি আমাদের উপাসনার উপযুক্ত" (আয়ুর্বেদঃ দেবীচাঁদ)।

উপরোল্লিখিত আলোচনা ছাড়াও হিন্দুধর্মগ্রন্থগুলোতে অসংখ্য শ্লোক রয়েছে সর্বশক্তিমান এক স্রষ্টা সম্পর্কে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, একশ্রেণির পুরোহিত ও পণ্ডিতগণ নিজেদের স্বার্থে বা ভুলপথে পরিচালিত হয়ে

www.nagorikpathagar.org

ধর্মগুলোতে দ্বিত্ববাদ, প্রকৃতিবাদ, বহুত্ববাদ, নরবাদ, জড়বাদ, সর্বেশ্বরবাদ প্রভৃতির সংযোজন করে গোটা সমাজকে চরম বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। যেহেতু হিন্দুধর্মের কোন একক প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না এবং এটা ছিল অনেক পুরাতন একটা ধর্ম। সুতরাং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মুনি ঋষিগণ যেভাবে মানুষদেরকে পরিচালিত করেছেন তারা সেইভাবে চলেছেন। একক কোন প্রবর্তক না থাকার কারণে যুগে যুগে বিভিন্ন মুনি ঋষিদের মাধ্যমে এর ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। ফলে হিন্দুধর্মের একক কোন ধর্মগ্রন্থও নেই। অনেক ধর্মগ্রন্থ রয়েছে যা বিভিন্ন সময়ে লেখা হয়েছে।

শিখ ধর্মে স্রষ্টা (আল্লাহ) সম্পর্কে ধারণা :

শিখ ধর্ম মূলত হিন্দু ধর্মেরই একটি শাখা যা গুরু নানক কর্তৃক পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত হয়েছে। গুরুনানক হিন্দু ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি গভীরভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের দ্বারা প্রভাবিত হন।

শিখ ধর্ম এক ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী। শিখদের ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে 'গুরুগ্রন্থ সাহেব'। গুরুগ্রন্থ সাহেব ভলিউম ১-এ জাপূজী এর প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে যে, 'ঈশ্বর মাত্র একজন যাকে বলা হয় সত্যিকার সৃষ্টিকর্তা তিনি ভয় ও ঘৃণা থেকে ঊর্ধ্বে। তিনি অমর, তিনি জাতকহীন, তিনি স্বয়ম্ভু, তিনি মহান ও করুণাময়।'

শিখ ধর্ম তার অনুসারীদেরকে কঠোরভাবে একত্ববাদের দীক্ষায় দীক্ষিত করে, এ ধর্ম এক সার্বভৌম বিমূর্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। স্রষ্টাকে তারা ওয়হি গুরু অর্থাৎ একক সত্য ঈশ্বরও বলে থাকে। স্রষ্টাকে তারা আরও অনেক নামে ডাকে। শিখ ধর্ম কঠোরভাবে একত্ববাদে বিশ্বাসী হলেও তা অবতারবাদে বিশ্বাস করে না। তারা মূর্তিপূজারও ঘোর বিরোধী।

ইহুদি ধর্মে স্রষ্টা (আল্লাহ) সম্পর্কে বিশ্বাস :

ইহুদি ধর্ম স্রষ্টার একত্ববাদে বিশ্বাসী একটি ধর্ম। ইহুদিগণ সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা হিসেবে যে এক ও একক সত্তায় বিশ্বাস করে তার নাম 'জেহোভা'। তাদের প্রধান ধর্মগন্থের নাম তাওরাত যা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসা (আ) এর নিকট নাযিল হয়েছে। এটি হিব্রু ভাষায় নাযিলকৃত। হিব্রুতে এর নাম তৌরাত। ইহুদিদের ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে তৌরাত বাইবেলের পুরাতন অংশ যাকে Old Testament নামে অভিহিত করা হয়। তাওরাতে ইহুদি জাতির সাথে জেহোভার দশটি চুক্তির কথা উল্লেখ আছে যাকে তারা Ten commandments বলে। এই দশ চুক্তির প্রথমটি হচ্ছে "তারা এক জেহোভা ছাড়া আর কারও উপাসনা করবে না। তার সাথে অন্য কাউকে শরিক করবে না।" কুরআন মাজিদেও আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার ৮৩-৮৪ নম্বর আয়াতে এই দশটি চুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

ইহুদি ধর্মের মূলনীতি সমূহের প্রথম মূলনীতি হচ্ছে 'জেহোভা' একত্ববাদে বিশ্বাস করা। বাইবেলের 'পুরাতন নিয়ম' এর 'ডিওটারেনমি' অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।
"ইসরাইলিরা শোনো আমাদের প্রভু ঈশ্বর একক" (বাইবেল, ডিওটারেনমি ৩:৪)।
বাইবেলের 'ঈসাইয়্যাহ' অধ্যায়ে বলা হয়েছে– "আমি, আমিই একমাত্র প্রভু এবং আমি ছাড়া অন্য কোন ত্রাণকর্তা নেই" (বাইবেল, ঈসাইয়্যাহ ৪৩:১১)।
ইহুদি ধর্মে প্রতিমা পূজাকে নিন্দা করা হয়েছে, "আমার পাশাপাশি তুমি অন্য কাউকে ঈশ্বর হিসাবে গ্রহণ করবে না; তুমি নিজের জন্য কোন প্রতিমা তৈরি করবে না; অথবা উর্ধ্বাকাশে অথবা পৃথিবীতে আছে অথবা ভূগর্ভে জলে আছে এমন কোন কিছুর সদৃশ্য স্থির করবে না; তুমি তাদের সামনে বিনীত হবে না আর না তাদের দর্শন করবে; কেননা আমিই একমাত্র প্রভু, তোমার ঈশ্বর..." (বাইবেল, এক্সোডাস ২০:৩-৫)।

খ্রিষ্ট ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা :

যিশুখ্রিষ্ট তথা ঈসা (আ) এর নামানুসারে খ্রিষ্টধর্মের নামকরণ করা হয়েছে। ঈসা (আ) ইসলাম ধর্মেও অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। খ্রিষ্ট ধর্ম ছাড়াও অন্য সকল ধর্ম মতের মধ্যে একমাত্র ইসলামই ঈসা (আ) এর নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।
খ্রিষ্টানরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী। খিষ্টধর্মে তিন সত্তার সমষ্টিকে খোদা বলা হয়। God the father, (পিতা ঈশ্বর)। God the son (পুত্র ঈশ্বর) এবং God the holy spirit (পবিত্র সত্তা ঈশ্বর)। তাদের মতে তিন সত্তা মিলেই এক ঈশ্বর। কিন্তু বাইবেল খ্রিষ্টানদের এই ত্রিত্ববাদকে কখনো সমর্থন করেনি। একদা বাইবেলের একজন লিপিকার যিশুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, ঈশ্বরের সর্বপ্রথম নির্দেশ কোনটি? তিনি বললেন– "হে ইসরাইলিরা শোন; আমাদের প্রভু ঈশ্বর একক প্রভু" (মার্ক ১২:২৯)।
খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা ঈসা (আ) কে ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন সত্তা ও উপাস্যের যোগ্য মনে করে, যা ইসলাম স্বীকার করে না। খ্রিষ্ট ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নে জানা যায় যে ঈসা (আ) কখনো নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেননি। মূলত বাইবেলের নতুন নিয়মে এ জাতীয় দাবি সংবলিত একটি বাক্যও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে তিনি বলেছেন 'আমি ঈশ্বর' বা 'আমাকে' উপাসনা করো। বরং বাইবেলে এমন একাধিক বাক্য রয়েছে যা এর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। যেমন,
"আমার পিতা সবার চেয়ে মহান" (যোহন ১০:২৯)।
"আমি সকল মন্দ আত্মাকে তাড়াই ঈশ্বরের শক্তিতে" (মথি ১২:২৮)।
"আমি নিজে কিছুই করতে পারি না ; আমি যেমন শুনি তেমন-ই বিচার করি এবং

www.nagorikpathagar.org

আমার বিচার নিছক। কেননা আমি নিজের ইচ্ছায় কিছু করতে চাই না বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন; সেই পিতার ইচ্ছানুসারেই আমি কাজ করতে চাই।"

যিশু (ঈসা আ), মুসা (আ) এর আইনকে অর্থাৎ তাওরাতকে পূর্ণ করতে এসেছেন যা ইহুদিদের হাতে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। মথি লিখিত Gospel- এ যা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে,

"তোমরা মনে করো না যে, আমি মুসা (আ) এর তাওরাতের বিধান ধ্বংস করতে এসেছি, আমি ধ্বংস করতে আসিনি, বরং সেসব পূর্ণ করতে এসেছি। আমি তোমাদেরকে সত্যই বলছি- আকাশ ও পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন সেই বিধানের একটি মাত্রা বা একটি বিন্দুও মুছে যাবে না, যতক্ষণ না পরিপূর্ণ হয়" (বাইবেল মথি ৫:১৭-২০)।

যিশু ঈশ্বরের প্রেরিত এবং মনোনীত এক মানুষ; যিশু ছিলেন স্রষ্টার পক্ষ থেকে একজন প্রেরিত ও মনোনীত মহান মানুষ। এই সম্পর্কে বাইবেলে বলা হয়েছে যে,

"এবং তোমরা যা আমার থেকে শোনো তাতো আমার কথা নয়, বরং সেসব কথা পিতার, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন" (বাইবেল-যোহন : ১৭:৩)।

যিশু তার উপর দেবত্ব আরোপের বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন। বাইবেলে উল্লিখিত আছে।

"এবং দেখো, একজন এলো এবং যিশুকে বললো ওহে ভাল প্রভু! আমাকে এমন ভালো কাজ সম্পর্কে বলুন যা করলে আমি অনন্ত জীবন লাভ করতে পারবো। যিশু তাকে বললেন, আমাকে ভালো বলছ কেন, এক ছাড়া কেউ ভাল নয়, আর তিনি হলেন 'ঈশ্বর' তুমি যদি অনন্ত জীবন লাভ করতে চাও, তবে তার সব আদেশ পালন করো" (বাইবেল মথি ৫:৭২০)।

এ বিবরণ দ্বারা যিশুর ঈশ্বর' হওয়া সংক্রান্ত খ্রিষ্টানদের মতবাদ এবং যিশুর আত্মত্যাগের মাধ্যমে তাদের পরিত্রাণ লাভের মতবাদ বাইবেল প্রত্যাখ্যান করেছে। যিশু যে একজন নবী ছিলেন তা বাইবেল দ্বারাই প্রমাণিত এবং তা ইসলামের বিশ্বাসকে সমর্থন করে।

খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদকে সুন্দর ভাবে যুক্তি সহকারে খণ্ডন করেছেন ড. মরিস বুকাইলি তার 'বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান' নামক গ্রন্থে, তিনি একজন খ্রিষ্টান ছিলেন। পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ঈসা (আ) বা যিশু কখনোই আল্লাহর পুত্র বা ঈশ্বর এর অংশ ছিলেন না। তাকে ঈশ্বরপুত্র বলে বিশ্বাস করলে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মাঝে কোন পার্থক্য থাকেনা। কারণ যিশু ঈশ্বর হলে কিভাবে তিনি মানুষের মত করে

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীতে এলেন। মানুষের সাথে বসবাস করলেন, ইহুদিদের দ্বারা কিভাবে তিনি নির্যাতিত হলেন?
ঈশ্বর কিভাবে একজন মহিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন? সৃষ্টি সমীম, স্রষ্টা অসীম, অসীম যদি সসীম এর এই সাধারণ গুণ ধারণ করেন তাহলে তো তিনি আর অসীম থাকতে পারেন না। সুতরাং যিশু কোনভাবেই আল্লাহর পুত্র হতে পারেন না।

জরথুস্ত্রীয় ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা :
জরথুস্ত্রীয় ধর্ম, প্রায় তিন থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে পারস্যে (বর্তমান ইরান অঞ্চলে) এ ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। এটা প্রাচীন ধর্মগুলোর একটি ইরানি নবী 'জরস্টার' কে এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা হয়। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে 'দসতির' ও 'আবেস্তা'। এই ধর্ম একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম। এই ধর্মের অনুসারীরা ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে মানত। ঈশ্বরকে (Ahura Mazda) আহুরা মাজদা নামে ডাকা হয়। 'আহুরা' অর্থ 'প্রভু' 'মাজদা" অর্থ প্রাজ্ঞ, আহুরা মাজদা অর্থ প্রাজ্ঞ প্রভু।
দসতির ও আবেস্তা অনুসারে আহুরা মাজদার অনেক গুণাবলী রয়েছে। যেমন- "তিনি একক, কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি আদি অন্তহীন, তাঁর পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র কিছুই নেই, তাঁর কোন আকার আকৃতি নেই, দৃষ্টি তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, কল্পনাশক্তিও তাঁকে আয়ত্ত করতে পারেনা তিনি মানবীয় ধারণা ও কল্পনার বহু উর্ধ্বে।"

ইসলামের সাথে জরথুস্ত্রীয় ধর্মের অনেক মিল রয়েছে। সূরা ইখলাসে আল্লাহর যে গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর সম্পূর্ণটাই এই ধর্মের ঈশ্বরের সাথে মিলে যায়। মুসলমানরা যেমন দিনে পাঁচবার সালাত আদায় করে তারা তেমনি পাঁচবার প্রার্থনা করে থাকে, এমনকি প্রার্থনার সময়ও দুই ধর্মের প্রায় একই সময়ে। মুসলমানদের পরকালের ধারণাও এই ধর্মের পরকালের ধারণার সাথে মিলে যায় এমনকি পুলসিরাতের ধারণও রয়েছে জরথুস্ত্রীয় ধর্মে যাকে তারা বলে 'চিনবাথ ব্রিজ'। মুসলমানদের পারস্য বিজয়ের পূর্বে পারস্য জুড়ে এর অনেক অনুসারী ছিল, মুসলমানরা আসার পর বেশির ভাগ অনুসারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।
কিছু কিছু ধর্ম রয়েছে যা অজ্ঞেয়বাদে বিশ্বাসী, যেমন বৌদ্ধ ধর্ম ও কনফুসীয় ধর্ম। এরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারও করে না আবার অস্বীকারও করে না। মূলকথা হচ্ছে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কিছু না জানা। অপর কিছু ধর্ম রয়েছে যেমন জৈন ধর্ম- এগুলো নাস্তিক্যবাদী ধর্ম। এরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামে 'আল্লাহ' সম্পর্কে ধারণা :

ইসলাম অর্থ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ। মুসলমান কুরআনকে আল্লাহর বাণী হিসাবে গ্রহণ করে। যা মুহাম্মদ (সা) এর উপর নাযিল হয়েছে। কুরআনে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূরাটি হচ্ছে সূরা আল ইখলাস। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

"বলুন তিনি আল্লাহ একক। আল্লাহ মুখাপেক্ষিহীন (কিন্তু সবকিছু বা সবাই তার মুখাপেক্ষী), কাউকে তিনি জন্মদান করেননি এবং কারো থেকে তিনি জন্মগ্রহণও করেননি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই" (সূরা ইখলাস ১-৪)।

সূরা ইখলাসকে কুরআন মাজিদের কষ্টিপাথর বলা হয়। এই সূরার চারটি আয়াত মুসলমানের জন্য আল্লাহ সংক্রান্ত জ্ঞানের কষ্টিপাথর হিসেবে বিবেচিত। প্রত্যেক উপাস্যের দাবিদারকে অবশ্যই এ সূরার কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হতে হবে। আল্লাহর যে পরিচয় এ সূরায় দেয়া হয়েছে, তার আলোকে মিথ্যা দেব-দেবী এবং ঐশ্বরিকতার দাবিদারদের মিথ্যা দাবি অত্যন্ত সহজেই নাকচ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার পরিচয় সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত রয়েছে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তার সাথে কাউকে শরিক করা যাবেনা, তিনি আমাদের রিজিকদাতা, আমাদের সৃষ্টিকর্তা। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

মুসলমানরা ঈশ্বরকে আল্লাহ নামে ডাকে। তারা ইংরেজি শব্দ 'গড' এর পরিবর্তে একক সৃষ্টিকর্তাকে 'আল্লাহ' নামেই ডাকে। 'গড' এর চেয়ে আরবি শব্দ 'আল্লাহ'ই সৃষ্টিকর্তার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ও যথার্থ। 'গড' শব্দের সাথে 'এস' যোগ করলে তা বহুবচন হয়ে যায় কিন্তু 'আল্লাহ' একক সত্তা। এ শব্দের কোন বহুবচন হয় না। আবার 'গড' এর সাথে '(es) যোগ করলে তা স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে কোন পুলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ নেই। 'আল্লাহ' শব্দের লিঙ্গান্তর হয় না। 'গড' শব্দের আগে tin শব্দাংশ যোগ করলে তার অর্থ দাঁড়ায়, 'মিথ্যা উপাস্য' আল্লাহ শব্দটি এমন এক অসাধারণ ও অদ্বিতীয় শব্দ যা সম্পর্কে কল্পনা করে কোন আকৃতি বা আকার ধারণ করা বা তা নিয়ে কোন প্রকার যথেচ্ছাচার করা যায় না। এসব কারণে মুসলমানগণ এক ও অদ্বিতীয় উপাস্যকে 'আল্লাহ' নামেই ডাকে।

'আল্লাহ (গড)' কখনো মানুষ হতে পারে না :

কিছু লোক যুক্তি পেশ করেন যে, ঈশ্বর যদি সবকিছু করতে সক্ষম, তবে তিনি মানুষ হতে বা মানবাকৃতি ধারণ করতে পারবেন না কেন? তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে তিনি মানবাকৃতি ধারণ করতে পারেন; কিন্তু এই যুক্তি মেনে নিলে ঈশ্বর আর ঈশ্বর থাকতে পারেন না। কেননা ঈশ্বর আর মানুষের গুণ বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ক্ষেত্রেই বিপরীতধর্মী।

www.nagorikpathagar.org

ঈশ্বর বা স্রষ্টা অবিনশ্বর কিন্তু মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টি নশ্বর। মানব ঈশ্বর তথা এমন কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই যার মধ্যে অবিনশ্বর ঐশ্বরিক সত্তা নশ্বর মানবদেহ ধারণ করবে। এ জাতীয় ধারণা অর্থহীন ও যুক্তিহীন।

ঈশ্বর এর বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি অনাদি ও চিরন্তন। অপরদিকে মানুষের শুরু যেমন আছে তেমনি শেষও আছে। এমন কোন সত্তা মানুষের মধ্যে বা অন্য কোন সৃষ্টির মধ্যে নেই যার মধ্যে শুরু না থাকা এবং শুরু থাকা উভয়ই বিদ্যমান আছে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পানাহারের প্রয়োজন নেই কিন্তু মানুষকে তার জীবনকে কর্মচঞ্চল রাখার জন্য পানাহার করতে হয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "তিনি খাদ্য দান করেন, কিন্তু তাকে খাদ্য দান করা হয় না" (সূরা আনয়াম : ১৪)।

আল্লাহর কখনো বিশ্রাম বা নিদ্রার প্রয়োজন হয় না; অথচ মানুষ এবং অন্য সকল সৃষ্টির বিশ্রামের প্রয়োজন হয়।

আল্লাহর বাণী, "আল্লাহ্ তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না তন্দ্রা ও নিদ্রা। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবকিছুই তাঁর" (সূরা আল- বাকারা : ২৫৫)।

কিছু লোক 'অন্ধ ও বধির' :

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মানবীয় গুণ বৈশিষ্ট্য ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আমরা এ বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে বিভিন্ন কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করে নিয়েছি। কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন এমনই এক একেকটি যন্ত্র। এ সব যন্ত্রের কী ভালো ও কী মন্দ বা কিভাবে চালাতে হবে এটা জানানোর জন্য কি মোবাইল বা কম্পিউটারের আবিষ্কারক মোবাইল বা কম্পিউটারের রূপ ধারণ করে এসে জানিয়ে দিবেন? বরং এটাই স্বাভাবিক যে, প্রস্তুতকারক তার এ যন্ত্রের উৎপাদন ও চালানোর নিয়ম পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধিমালা সংবলিত একটি পেপার বা ক্যাটালগ তৈরি করবেন যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও নিয়মাবলী জানতে পারে। কিন্তু প্রস্তুতকারককে মোবাইলের বা কম্পিউটারের রূপ ধারণ করার প্রয়োজন নেই।

অনুরূপভাবে আমরা (মানুষ) আল্লাহর এক জটিল ও সুনিপুণ সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই দুনিয়াতে এসে মানবাকৃতি ধারণ করে মানুষের জন্য কী ভালো আর কী মন্দ তা জানিয়ে দেয়ার। তিনি মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা সংবলিত গ্রন্থ দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সাথে একজন বার্তাবাহকও পাঠিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীর সূচনা থেকে শেষ নবী পর্যন্ত অসংখ্য বার্তাবাহক পৃথিবীর জাতিগোষ্ঠীগুলোর মাঝে এসেছেন এবং তাদেরকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এরপরও কিছু

www.nagorikpathagar.org

মানুষ এ সত্যকে অস্বীকার করে এবং এরা অন্যদেরকেও এটা শিক্ষা দেয়। এ সমস্ত লোকই প্রকৃতপক্ষে 'অন্ধ ও বধির' যদিও সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে শ্রবণেন্দ্রীয় ও দর্শনেন্দ্রীয় দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "তারা বধির, বোবা ও অন্ধ, তারা (সঠিক পথে) ফিরে আসবে না" (সূরা-বাকারা : ১৮)।

বাইবেলে উল্লেখ আছে–"তারা দেখেও দেখে না এরা শুনেও শুনে না, তারা বুঝতেও সক্ষম নয়" (মথি ১৩:১৩)।
হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ 'ঋগবেদে'ও বর্ণিত আছে "এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা বাণীসমূহ দেখে, প্রকৃতপক্ষে তারা দেখে না; এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা এ বাণীসমূহ শোনে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা শোনে না" (ঋগবেদ : ১০:৭১:৪)।
এসব পবিত্র গ্রন্থের বাণী তাদের পাঠকদেরকে বলে যে, যদিও ঈশ্বরের বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট তবুও এরা সত্য থেকে বিচ্যুত-ই হয়ে যাবে।

আল্লাহর একত্ব :
আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তার কোন শরিক নেই, যারা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যদি এই ভূমণ্ডলে একাধিক ঈশ্বর থাকতো তাহলে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতো, এক ঈশ্বর আরেক ঈশ্বরের সাথে দ্বন্দ্বে লেগে যেতো। এটাই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে,
"যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য 'ইলাহ' থাকতো, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব আরশের অধিপতি আল্লাহ সেসব বিষয় থেকে পবিত্র যা তারা বলে থাকে" (সূরা আম্বিয়া : ২২)।
অতএব, এক ও অদ্বিতীয় সার্বভৌম, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর-এর অস্তিত্ব থাকাটাই যুক্তি ও বুদ্ধির দাবি।
সকল প্রধান প্রধান ধর্মই মূলত এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী। সকল ধর্মগ্রন্থই একত্ববাদের কথাই বলে থাকে। অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় সত্য-ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথাই বলে। কিন্তু মানুষ নিজেদের স্বার্থে যুগে যুগে ধর্মগ্রন্থের পরিবর্তন সাধন করেছে। ফলে বেশিরভাগ ধর্মগ্রন্থই বিকৃত ও পরিবর্তন হয়ে গেছে। একত্ববাদ থেকে সর্বেশ্বরবাদ, বহু ঈশ্বরবাদ বা ত্রিত্ববাদে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলামের গ্রন্থ আল কোরআনই আসল।
কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা বলেন– "সুতরাং আফসোস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ; যাতে এর বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য পেতে পারে। কাজেই তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য এবং তারা যা উপার্জন করেছে তার জন্যও আক্ষেপ" (সূরা বাকারা : ৭৯)।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সমূহ

ইসলাম মানুষের নিকট এক শাশ্বত ও চিরন্তর আহবানের নাম। কিছু মৌলিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে এই আহবানের সূচনা হয়। এই বিশ্বাসের ঘোষণাগুলোই একজন মানুষকে তার জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে সাহায্য করে। মানুষকে এক চিরন্তন ও মহান সত্যের দিকে ধাবিত করে। ইসলাম যে সকল মৌলিক বিশ্বাস পোষণ করার দাবি করে তা আমরা আলোচনা করব।

০১. তাওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদ :

মানুষ এই বিশাল সৃষ্টিজগৎ দেখতে পায়। স্বভাবতই মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে এই বিশাল সৃষ্টিজগতের পেছনে কে আছেন? কে অত্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে ও সুচারুরূপে এই সবকিছু পরিচালনা করছেন? তাওহিদ বা এক আল্লাহর ধারণা মানুষকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়। এই বিশাল সৃষ্টিজগতের পেছনে রয়েছেন এক মহান ক্ষমতাধর আল্লাহ। যিনি মানুষসহ অন্যান্য সকল কিছু তৈরি করেছেন। তিনিই মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে তাঁর উপাসনা করার উপযোগী করে তৈরি করেছেন। এই পৃথিবীতে সকল মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের সকল কাজে এই মহান আল্লাহর দাসত্ব করা।

কুরআনে আল্লাহর ধারণা বলতে গিয়ে ঘোষণা হচ্ছে– "বলো, আল্লাহ এক। তিনি অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি আর তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি, কোন কিছুই তার সমকক্ষ হতে পারে না " (সূরা ইখলাস : ০১-০৪)।

সৃষ্টিকর্তার একত্ব ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সৃষ্টিকর্তা কখনো একাধিক হতে পারে না। কোন দৃশ্যমান বা কল্পনা করা যায় এমন কিছুর সাথে সৃষ্টিকর্তাকে কোনভাবেই তুলনা করা যায় না। কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বর বা আল্লাহর সাথে তুলনা করা সম্ভব নয়। মানুষের পক্ষে সৃষ্টিকর্তাকে দেখা সম্ভব নয়। তবে সৃষ্টিকর্তার নিদর্শন বা শক্তিকে মানুষ দেখতে ও অনুভব করতে পারে। শক্তি, ক্ষমতা, উপাস্য বা গুণের দিক থেকে এক আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করাকে ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

জীবন-মৃত্যু, রিজিক, প্রতিপালনসহ সব কিছুই মহান আল্লাহর নির্দেশে পরিচালিত হয়। আল্লাহর নির্দেশেই কোনো কিছু তৈরি হয় আবার তাঁর নির্দেশেই কোনকিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

www.nagorikpathagar.org

কুরআনে বলা হয়েছে-" তিনি যখন কোন কিছু তৈরি করার ইচ্ছা পোষণ করেন, তিনি বলেন-হও! আর সাথে সাথেই তা হয়ে যায়" (সূরা ইয়াসিন : ৮২)।
"মহান আল্লাহ ছয়দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং তারপরে তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন" (সূরা আল ফুরকান-৫৯)।
মহান আল্লাহ হচ্ছেন সমস্ত গুণ ও জ্ঞানের আধার। পবিত্র কুরআনে তার ৯৯টিরও বেশি গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ হচ্ছেন চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব, সবচেয়ে দয়ালু, সর্বস্রষ্টা, সর্বশ্রোতা ও মহাপরাক্রমশালী।

ইসলাম মানুষের নিকট আল্লাহর ব্যাপারে তিন ধরনের দাবি পেশ করছে। তা হচ্ছে-
প্রথমত, মহান আল্লাহকে একমাত্র প্রতিপালক বা 'রব' হিসেবে বিশ্বাস করা। এর অর্থ হচ্ছে- এভাবে ঈমান আনয়ন করা যে তিনিই একমাত্র প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, তাঁর সমুদয় সৃষ্টির সর্বময় ব্যবস্থাপক এবং তাদের বিষয়ে সর্বাধিক পরিবর্তনের একমাত্র অধিকারী।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তায়ালাকে একমাত্র 'ইলাহ' (বিধানদাতা) হিসেবে বিশ্বাস করা। এর অর্থ হচ্ছে- মানুষের সকল ইবাদাত বা উপাসনা প্রাপ্তির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তা'য়ালা।

তৃতীয়ত, আল্লাহ তা'য়ালার নাম ও গুণের প্রতি ঈমান আনা। অর্থাৎ, তাঁর সুন্দরতম নামসমুহ এবং পরিপূর্ণ ও মহান গুণাবলী যেভাবে তাঁর কিতাব ও নবী মুহাম্মদ (সা) এর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে, সেভাবে বিশ্বাস করা।

ইসলামী বিশ্বাসের প্রাণকেন্দ্রই হচ্ছেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা। এমন এক উপাস্যে বিশ্বাস করা যার দৃষ্টি এড়িয়ে মানুষের পক্ষে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। এই বিশ্বাস মানুষের মধ্যে জবাবদিহিতার অনুভূতি তৈরি করে। ফলে, মানুষের পক্ষে অন্যায় থেকে দূরে থাকা সহজ হয়ে যায়। আবার মহান পরাক্রমশালী ও দয়ালু আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন মানুষকে চূড়ান্ত আশাবাদী করে তোলে, ভীষণ বিপদের মুহূর্তেও তাঁর কাছে আশ্রয়স্থল পাওয়া যায়। অগণন পাপ করেও তাঁর কাছে সত্যিকারের ক্ষমা চেয়ে সুন্দর জীবনে ফিরে আসা যায়।

০২. নবী বা বার্তাবাহকের প্রতি বিশ্বাস :

মহান আল্লাহ যেহেতু দৃশ্যমান কোন সত্তা হিসেবে মানুষের সামনে আবির্ভূত হন না, তাই তিনি যুগে যুগে নবী বা বার্তাবাহক পাঠিয়ে মানুষকে সতর্ক করেন ও

www.nagorikpathagar.org

সত্যপথ প্রদর্শন করেন। নবীরা আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত হন এবং তাঁরা মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেন।

নবীগণের মাধ্যমেই মহান আল্লাহ তার বিধি-বিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। নবীগণের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ছাড়া সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। নবীগণের জ্ঞান মহান আল্লাহর কাছে থেকে সরাসরি প্রাপ্ত নিশ্চিত জ্ঞান।

ইসলামের প্রথম নবী হচ্ছেন হযরত আদম (আ) এবং সর্বশেষ নবী হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (সা)।

ইসলামে নব্যুয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো-

প্রথমত, মানুষকে তাদের প্রতিপালক প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার সাথে পরিচিত করা, তাঁর সুন্দরতম নাম সমূহের সাথে যে নামের সর্বনামের অধিকারী কেউ নেই, তার মহান গুণাবলীর সাথে যাতে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ কার্যাবলীর সাথে যাতে তাঁর কোন শরিক নেই। এবং সকল বিষয়ে তার একক অধিকারের সাথে যাতে তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

দ্বিতীয়ত, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদাতের (উপাসনার) প্রতি বান্দাদের আহবান করা, তাঁর কিতাব ও নবীর মাধ্যমে আদেশ ও নিষেধ সংবলিত মানুষের জন্য যে জীবনবিধান তিনি দান করেছেন, তার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবজাতির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সৌভাগ্য নিশ্চিত করা।

তৃতীয়ত, মানুষকে তাদের অবস্থা ও মৃত্যুর পরে তাদের প্রত্যাবর্তন বিষয়ে উপদেশ দেয়া। কবরে অচিরেই তারা কী প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের পুনরুত্থান ও হিসাব নিকাশ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা। পরকালে তাদের আমল ভালো হলে ভালো ফলাফল বা পুরস্কার এবং মন্দ হলে মন্দ ফলাফল বা শাস্তির ঘোষণা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়াও তাদের অন্যতম কাজ। আর সে ফলাফলকে ইসলামে বলা হয়েছে জান্নাত ও জাহান্নাম।

ইসলামের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী হচ্ছেন মুহাম্মদ (সা)। তাঁকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করা ও তাঁর সমস্ত কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর সমস্ত আদেশ নিষেধ মেনে চলার মধ্যেই ইসলামের মৌলিক দাবি নিহিত রয়েছে।

৩. আখিরাত বা পরকালে বিশ্বাস :

ইসলামের একেবারে মৌলিক বিশ্বাসের আরেকটি হচ্ছে আখিরাত বা মৃত্যুপরবর্তী কালীন জীবনে বিশ্বাস। এই পৃথিবীই মানুষের শেষ ঠিকানা নয় বরং এক অনন্ত

www.nagorikpathagar.org

জীবনের প্রতিফল তৈরির জায়গা। ইসলামী বিশ্বাসমতে পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষকে পাঠিয়েছেন পরীক্ষার জন্য। এই পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হতে পারবে আখেরাতে তারাই সফলকাম হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে – "আর আখিরাতই তোমার জন্য দুনিয়ার জীবন থেকে উত্তম জায়গা" (সূরা আদ-দুহা : ০৪)।

এই পৃথিবী চিরস্থায়ী থাকার জায়গা নয়। মানুষসহ অন্যান্য সকল প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মৃত্যুর পরে মানুষের জন্য কী আছে, এ নিয়ে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা রয়েছে। ইসলামী বিশ্বাস মতে, মৃত্যুর পরে মানুষের কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়। সেগুলো হচ্ছে–

ক. কবর জীবন
খ. পুনরুত্থান ও বিচার
গ. চূড়ান্ত পরিণতি

কবর জীবন :

কবর জীবন বলা হয় মৃত্যুর পর পরই মানুষকে যে জীবনের সম্মুখীন হতে হয় তাকে। মানুষ যেভাবেই বা যেখানেই মৃত্যুবরণ করুক না কেন, পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত তার এই জীবনকে কবর জীবন বলা হয়।

মৃত্যুর পর মানুষকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে। সে গুলো হচ্ছে–

ক. তোমার রব (সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা) কে ?
খ. তোমার দ্বীন (জীবনব্যবস্থা/ধর্ম) কী?
গ. তোমার নবী কে?

যারা এই প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দিতে পারবে, তাদের পরবর্তী সময় হবে সুখকর। আর এই সব প্রশ্নের উত্তর শুধুমাত্র তারাই দিতে পারবে, যারা এই পৃথিবীতে ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ইসলাম প্রদত্ত জীবনবিধান অনুযায়ী তাদের জীবন পরিচালনা করেছে।

যারা এই পৃথিবীতে আল্লাহর এই বিধান গ্রহণ করবে না ও এ অনুযায়ী জীবন যাপন করবে না তারা ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে এবং বলবে,'হায় ! আমিতো কিছুই জানি না।' আর এর পরে তাদের জন্য থাকবে কঠোর শাস্তি। কিয়ামত ও পুনরুত্থান সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের এই অবস্থা চলতে থাকবে।

পুনরুত্থান ও বিচার :

কবর জীবন শেষ হবে কিয়ামত (সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়া) সংঘটিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। আল্লাহ নিজেকে ব্যতীত সবকিছুকেই ধ্বংস করে দিবেন। এই

www.nagorikpathagar.org

বিশাল ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কিয়ামত সংঘটিত হলে আল্লাহ্ সবকিছুকে আবার পুনরুত্থিত করবেন। বিশাল ময়দানে সবাইকে একত্রিত করবেন। এই সময়গুলো হবে ভয়ংকর। সূর্য মানুষের অত্যন্ত নিকটবর্তী হবে আর ময়দান হবে তামার তৈরি। সূর্যের উত্তাপে মানুষ ঘামতে থাকবে। পৃথিবীতে নিজেদের কৃতকর্ম অনুযায়ী কেউ কেউ খুবই কম, কেউ কেউ হাঁটু পর্যন্ত, কেউ গলা আবার কেউ নাক পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে। মানুষ একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছুটতে থাকবে। মহান আল্লাহর কাছে দ্রুত বিচারের ফরিয়াদ জানাবে।

এমতাবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উপস্থিত হয়ে বিচার শুরু করবেন। ফেরেশতাদের মাধ্যমে ধারণকৃত কৃতকর্মের হিসাব যার যার সামনে তুলে ধরবেন। নিজেদের কৃতকর্ম পড়ে মানুষ তাজ্জব বনে যাবে। তারা বলতে থাকবে –"এটা কেমন রেকর্ড! এখানে তো ছোট বড় কোন কিছুই বাদ পড়েনি" (সূরা কাহাফ : ৪৯)।

সেদিন মানুষের মুখ বন্ধ করে দিয়ে, তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো থেকে সাক্ষ্য নেয়া হবে। মানুষ সাহায্যের জন্য একজন আরেকজনের দিকে তাকাবে। কিন্তু কেউ কাউকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না।

বাবা-মা তার সন্তানদের চিনতে পারবে না। ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী কেউ পরস্পর পরস্পরকে পরিচয় দিবে না। সেই কঠিন সময়ে শুধুমাত্র তারাই মুক্তি পাবে, যারা তাদের স্বীয় সময়ের নবীদেরকে মেনে নিয়ে ঈমান (বিশ্বাস) স্থাপন করেছে এবং আল্লাহর বিধানসমূহ মেনে চলেছে।

বিচারের এই সময়ে আল্লাহ্ তায়ালা কোন ধরনের অবিচার করবেন না। সবাইকে তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিবেন। এই উৎকণ্ঠা, উদ্বেগের ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও তারা নিরাপদ থাকবে, যারা আল্লাহ ও তার নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের নির্দেশানুযায়ী আমল করেছে।

চূড়ান্ত পরিণতি :

আল্লাহ্ তায়ালা এই বিচারের মাধ্যমে সৎকর্মশীলদের জান্নাতে পাঠাবেন, যেখানে থাকবে অনাবিল সুখ-শান্তি। যেখানে মানুষের সকল ধরনের চাহিদা পূরণ করা হবে। আর সেদিন অবিশ্বাসী ও অসৎকর্মশীলদের (মুসলিম হলেও) পাঠানো হবে চিরস্থায়ী শাস্তির স্থান জাহান্নামে।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তাআলা বলেছেন–"সেদিন অবিশ্বাসীদের, জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছাবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বর আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করতো এবং সতর্ক করত এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে? তারা বলবে, হ্যাঁ। কিন্তু কাফেরদের প্রতি শাস্তির হুকুমই বাস্তবায়িত হয়েছে।
বলা হবে–
তোমরা জাহান্নামের দিকে তার দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্য। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের বাসস্থল!" (সূরা যুমার : ৭১,৭২)।

"তবে যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে সতর্ক ছিল তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর" (সূরা যুমার : ৭৩)।

জাহান্নাম হবে চিরস্থায়ী শাস্তির জায়গা। পৃথিবীতে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অমান্যকারীদের জন্য এটি হবে মহাবিভীষিকা। এই দিনে এই মানুষেরা আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে বলতে থাকবে– "হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম" (সূরা আন নাবা : ৪০)।

ইসলামের সমগ্র আহবানই মূলত আখিরাত কেন্দ্রিক। পৃথিবীর সুখ-শান্তির চেয়ে আখিরাতের সুখ-শান্তি গুরুত্বপূর্ণ। এই অল্প দিনের পৃথিবীতে মানুষের সবকিছুই মূলত মূল্যহীন। পৃথিবীতে ভোগ করার জন্য যেমনি মানুষকে পাঠানো হয়নি, তেমনি নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকার জন্যও পাঠানো হয়নি। আল্লাহকে ভালোভাবে জেনে- বুঝে নিজে এই পৃথিবীতে আল্লাহর আইন মান্য করা আর তার সাথে সাথে এই চিরন্তনতার দিকে অন্য সকল মানুষকে আহবান করার জন্যই মানুষের তৈরি।

পৃথিবীর এই স্বল্পকালীন সময়ে যেরকম একজন মানুষ তার ভালো কাজের পুরস্কার পুরোপুরি পেতে পারেনা, তেমনি মন্দ কাজের শাস্তিও পুরোপুরি পাওয়া সম্ভব নয়।
এই পৃথিবীতে দেখা যায়, কেউ কেউ আজীবন মানুষের উপর অত্যাচার করে যাচ্ছে আবার কেউ কেউ আজীবন অত্যাচারিত হয়েই মৃত্যুবরণ করছে। কেউ আজীবন মহাসুখে জীবন যাপন করছে। আবার কেউ কেউ মহা লাঞ্ছনা, বঞ্চনা,

www.nagorikpathagar.org

দারিদ্র্যের শিকার হয়ে মারা যাচ্ছে, ফলে পার্থিব এই দুনিয়াতে ন্যায় পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা পাওয়া সম্ভব নয়। আখিরাতের অস্তিত্বের মধ্য দিয়েই এই অপূর্ণতাকে পূর্ণতা বিধানের জন্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাত-জাহান্নাম তৈরি করেছেন। ধন-সম্পদ, সুখ থাকা বা না থাকা উভয়টিই আল্লাহ তা'য়ালার পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই আখিরাতে মহাশান্তি অপেক্ষা করছে।

তাই, ইসলামে মূলত দুনিয়া ও আখিরাত আলাদা কিছু নয়। আখিরাত হচ্ছে দুনিয়ারই ধারাবাহিকতা। আখিরাত মানুষের নিকট এক সচেতনতার নাম। যার মধ্য দিয়ে মানুষ অন্যায় ত্যাগ করে শান্তির পথে, ন্যায়ের পথে ফিরে আসার সাহস ও আত্মবিশ্বাস পায়।

এই আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এর জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নেয়াই ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৪. আসমানি কিতাব :

মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে নবীদেরকে আসমানি কিতাব সহকারে মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন।

এই আসমানি কিতাবগুলোই মূলত মানুষের করণীয় বর্জনীয় বিষয়গুলোকে নির্ধারণ করে দেয়। মানুষকে তৈরি করেছেন আল্লাহ, যার ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ-ই সবচাইতে ভালো জানেন, মানুষের জন্য কী বিধান দিতে হবে। যেই বিধান পালন করলে মানুষ পৃথিবীতে প্রশান্তি ও আখিরাতে চিরস্থায়ী সুখ লাভ করতে পারবে। তাই নবীগণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষের কর্তব্যের নির্ধারক আসমানি কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরকম মোট ১০৪ খানা আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এর মধ্যে ৪টি বড় বা প্রধান গ্রন্থ। সেগুলো হচ্ছে–

- যাবুর এটি হযরত দাউদ (ডেভিড) (আলাইহিস সালাম) এর উপর অবতীর্ণ করেছেন।
- তাওরাত (বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট)-এটি হযরত মুসা (মসেস) (আলাইহিস সালাম)-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে।
- ইঞ্জিল (বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট)-এটি হযরত ঈসা (যিশু) (আলাইহিস সালাম) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।
- কুরআন-হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ সর্বশেষ আসমানি কিতাব।

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত এই চারটি কিতাবের বাইরেও আরো ১০০টি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। এর সবগুলোই এসেছে মহান আল্লাহা রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে। অনেক ধর্মবিদ 'বেদ'-কেও মহান আল্লাহর কিতাব বলে মনে করেন। তবে বাস্তবতা হচ্ছে পবিত্র কুরআন ব্যতীত অন্যান্য আসমানি গ্রন্থগুলো মানুষের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। মানুষ নিজেদের ইচ্ছেমত এই গুলোতে সংযোজন-বিয়োজন করে নিয়েছে। তারপরও এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা) এর ব্যাপারে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মহান আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। সকল ধরনের মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বলতে দেখা যায়।

ঈমান আনয়নের জন্য অন্যতম শর্ত হচ্ছে এই মূল গ্রন্থগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। মুহাম্মদ (সা) এর পরে যারা পৃথিবীতে এসেছে তাদের কর্তব্য হচ্ছে, মুহাম্মদ (সা) কে নবী হিসেবে মেনে নিয়ে তার উপর অবতীর্ণ 'আল কুরআনকে' পুরোপুরি নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালানো।

'কুরআন' মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল মানুষের জন্য এক মহা দান। সারা পৃথিবীতে এর কোটি কোটি হাফিজ (মুখস্থকারী) রয়েছে। ১৪০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এক অবিকৃত গ্রন্থ যা মানুষকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে। যার সংস্পর্শে সত্যিকারভাবে আসতে পারলে মানুষ সোনার মানুষে পরিণত হয়ে ওঠে।

৫. ফিরিশতা :

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তার বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য ও তার নিরঙ্কুশ দাসত্বের জন্য ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন ধরনের ফেরেশতাদের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছে। নবীগণের নিকট 'জিবরাইল (আ)' নামে একজন ফিরিশতা আল্লাহর বাণী নিয়ে আসতেন।

মানুষের প্রত্যেকটি কাজ, চিন্তা-ভাবনাকে যথাযথভাবে ধারণ করার জন্য ফিরিশতাদের নিয়োজিত করা হয়েছে। ফিরিশতারা পবিত্র সত্তা। তারা আল্লাহর আদেশে মানুষের সাহায্য- সহযোগিতায় নিয়োজিত। তবে তাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলা বা তাদের নিজস্ব কোন শক্তি আছে এমন দাবিকে ইসলাম নাকচ করেছে এবং ভয়ংকর পাপ বলে সাব্যস্ত করেছে। এই ফিরিশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও ইসলামী বিশ্বাসের একটি মৌলিক দাবি।

৬. তাকদির বা নির্ধারিত ভাগ্য :

তাকদির হচ্ছে নির্ধারিত বিষয়। মানুষকে সৃষ্টি করে, মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সীমিত স্বাধীনতা প্রদান করেছেন, যার মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর দাসত্ব ও অস্বীকারের পথ দুটির মাঝে যে কোন একটি পথ বেছে নিতে পারে। এর বাইরেও

www.nagorikpathagar.org

মানুষের জীবনে নানা ধরনের প্রবণতা রয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলা যেহেতু সবকিছুর স্রষ্টা, সব কিছুর নিয়ন্ত্রক, সব কিছু সম্পর্কে জানেন; সুতরাং মানুষের সমস্ত প্রবণতা সম্পর্কে আল্লাহ জ্ঞাত। এই প্রবণতার মধ্যে কিছু ব্যাপারে তিনি মানুষকে স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন এবং কিছু বিষয় তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মানুষ পৃথিবীতে নানা অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের সম্মুখীন হয়। নানা দুঃখের মুখোমুখি হয়। আর এসবের মুখোমুখি হয়ে মানুষ চরমভাবে হতাশ হয়ে পড়ে এবং নানা ধরনের অন্যায়-অপকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়ে।

তবে, তার যদি জানা থাকে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং এসব মুহূর্তে দায়িত্ব হচ্ছে ধৈর্যধারণ করা, তবে তার জন্য পরিস্থিতি মোকাবেলা করা অনেক সহজ হয়ে যায়।

আবার একইরকমভাবে কখনো কখনো কিছু মানুষ নিজেদের ক্ষমতা, সামর্থ্যকে অন্যান্য মানুষের উপর নিজেকে বড় প্রমাণের জন্য ব্যবহার করে ও অন্যান্যদেরকে যথাযথ মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করে, অত্যাচার নির্যাতন করে, সে যদি জানত ও বিশ্বাস করত এগুলো সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং এগুলো তার জন্য পরীক্ষা, তবে তার জন্য এই সমস্ত অন্যায় থেকে বিরত থাকা সহজ হয়ে যায়।

ফলে ভাগ্যের এই ভালো-মন্দ সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। এমন বিশ্বাস মানুষকে সংযত করে এবং ন্যায় আচরণ করতে শেখায়। ইসলামে তাই এই তাকদিরে বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্যতম মৌলিক দাবি। এটি আল্লাহর প্রতি মানুষের নির্ভরশীলতা বাড়ায় ও একই সাথে মানুষকে ন্যায়নিষ্ঠ হতে সহায়তা করে।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অধিকার

আজকের দুনিয়ায় ইসলামের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার খুব জোরেশোরে চালানো হচ্ছে, মুসলিম সমাজে অমুসলিম কিংবা সংখ্যালঘুর অধিকার সুরক্ষিত নয়। অথচ এই অপপ্রচার একেবারেই অমূলক ও ভিত্তিহীন। অমুসলিমের অধিকার, সংখ্যালঘুর অধিকার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ইসলামই সর্বপ্রথম পৃথিবীর বুকে স্থাপন করেছে। ইসলাম পরমতসহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয় এবং পারস্পরিক সম্প্রীতির সঙ্গে সবার সহাবস্থান নিশ্চিত করে। প্রথমত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার অবকাশ নেই। ধর্মের ব্যাপারে যেকোনো ধরনের বল প্রয়োগ ও জবরদস্তি ইসলামে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন–"দ্বীনের ক্ষেত্রে কোনো বাড়াবাড়ি নেই" (সূরা বাকারা : ২৫৬)।

একটি মুসলিম দেশে ইসলাম মুসলিমকে শুধু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতেই বলে না বরং রাষ্ট্রে তাদের সার্বিক নিরাপত্তা এবং সুখ-সমৃদ্ধিও নিশ্চিত করে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহে একাধিক স্থানে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অধিকার তুলে ধরা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা নিজ নিজ উপাসনালয়ে উপাসনা করবেন। নিজ ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় উপাসনালয়কে সুরক্ষিত রাখবেন। তাদের প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্য ইসলাম বরদাশত করে না। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের যাদের সঙ্গে কোনো সংঘাত নেই, যারা শান্তিপূর্ণভাবে মুসলিমদের সঙ্গে বসবাস করেন তাদের প্রতি বৈষম্য দেখানো নয়, ইনসাফ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন– "আল্লাহ নিষেধ করেন না ওই লোকদের সঙ্গে সদাচার ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে যারা তোমাদের সঙ্গে ধর্মকেন্দ্রিক যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের আবাসভূমি হতে তোমাদের বের করে দেয়নি। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন" (সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত : ৮)।

আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানের দাবিদার প্রতিটি মুসলিমকে নির্দেশ দিয়েছেন পরমত সহিষ্ণুতা ও পরধর্মের বা মতাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে। আল্লাহ তা'য়াল ইরশাদ করেন, "তারা আল্লাহ তা'য়ালা বদলে যাদের ডাকে, তাদের তোমরা কখনো গালি দিয়ো না, নইলে তারাও শত্রুতার কারণে না জেনে আল্লাহ তা'য়ালাকেও গালি দেবে, আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই তাদের কার্যকলাপ সুশোভনীয় করে রেখেছি, অতঃপর সবাইকে একদিন তার মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে, তারপর তিনি তাদের বলে দেবেন, তারা দুনিয়ার জীবনে কে কী কাজ করে এসেছে" (সূরা আল আন'আম, আয়াত : ১০৮)।

www.nagorikpathagar.org

কোনো মুসলিম যদি কোনো অমুসলিমের প্রতি অন্যায় করেন, তবে রোজ কিয়ামতে খোদ নবী সা: তার বিপক্ষে লড়বেন বলে হাদিসে এসেছে। একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন– "সাবধান! যদি কোনো মুসলিম কোনো অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালিয়ে তার অধিকার খর্ব করে, তার ক্ষমতার বাইরে কষ্ট দেয় এবং তার কোনো বস্তু জোরপূর্বক নিয়ে যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ উত্থাপন করব" (আবূ দাউদ : ৩০৫২)।

অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, "যে মুসলিম নিরাপত্তা প্রাপ্ত কোনো অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ তার ঘ্রাণ পাওয়া যায় চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব থেকে" (বুখারী : ৩১৬৬)।
আরেক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি চুক্তিতে থাকা কোনো অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অসময়ে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন" (আবু দাউদ : ২৭৬০; নাসাঈ : ৪৭৪৭)।

ঐতিহাসিক বিদায় হজের দীর্ঘ ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সা) সমাজ ও রাষ্ট্রের সব দিক ও বিভাগ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি মাতা-পিতার হক, সন্তান-সন্ততির হক, আত্মীয়-স্বজনদের হক, অনাথ ও দরিদ্রদের হক, প্রতিবেশীর হক, মুসাফিরের হক, চলার পথের সঙ্গী বা পথচারীর হক, দাস-দাসী বা চাকর-চাকরানীর হক এমনকি ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমের হক সম্পর্কেও নির্দেশনা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজে মুসলিমদের কাছে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে আমানত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মুসলিমদের তিনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তা দানের নির্দেশ দিয়েছেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাদের ইজ্জত-আব্রু ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তার জন্য প্রহরীর দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ অমুসলিম জনগোষ্ঠী তারাও মানুষ, তারাও আল্লাহর বান্দা। ইসলাম সম্পর্কে তারা ভুল বা বিভ্রান্তির শিকার হলে তাদের প্রতি আক্রমণ না করে তাদেরকে মূল সত্য এবং ইসলামের মহানুভবতা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

ইসলামের দৃষ্টিকোণে দুনিয়ায় মানুষের প্রাণ হরণ কিংবা জীবন নাশের চেয়ে বড় অপরাধ আর হয় না। পবিত্র কুরআনে তাই একজন মানুষের হত্যাকে পুরো

www.nagorikpathagar.org

মানবজাতির হত্যা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৩২)।

মানুষের প্রাণহানি ঘটানোকে যেখানে বলা হয়েছে পুরো মানবজাতিকে হত্যার সমতুল্য, সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকে গণ্য করা হয়েছে হত্যার চেয়েও জঘন্য অপরাধ হিসেবে। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,"আর ফিতনা হত্যার চেয়েও কঠিনতর" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৯১)।

ইসলামী রাষ্ট্রে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের মৌলিক অধিকার

০১ . প্রাণের নিরাপত্তা

অমুসলিম নাগরিকদের রক্তের মূল্য মুসলমানদের রক্তের মূল্যের সমান। কোনো মুসলমান যদি অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে, তাহলে একজন মুসলমান নাগরিককে হত্যা করলে যেমন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো ঠিক তেমনি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর আমলে জনৈক মুসলমান অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি হত্যা করলে তিনি খুনিকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তিনি বলেন, "যে নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে, তার রক্তের বদলা নেয়ার দায়িত্ব আমারই" (ইনায়া শরহে হিদায়া, ৮ম খন্ড)।

হযরত ওমর (রা) এর খেলাফত আমলে বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের এক ব্যক্তি জনৈক হিরাবাসী অমুসলিম যিম্মিকে হত্যা করে। খলিফা ওমার (রা) খুনিকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাতে সমর্পণের আদেশ দেন। অতঃপর তাকে উত্তরাধিকারীদের হাতে সমর্পণ করা হলে তারা তাকে হত্যা করে (বুরহান শরহে মাওয়াহিবুর রহমান, ৩য় খণ্ড)।

হযরত উসমান (রা) এর খেলাফত আমলে হযরত ওমরের (রা) ছেলে উবায়দুল্লাহকে হত্যার পক্ষে ফতোয়া দেয়া হয়। কেননা তিনি হযরত ওমর (রা) এর হত্যার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে হরমুযান ও আবু লুলুর মেয়েকে হত্যা করেন।

হযরত আলী (রা) এর খেলাফত আমলে জনৈক মুসলমান জনৈক অমুসলিমের ভাইকে হত্যার দায়ে গ্রেফতার হয়। যথারীতি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তিনি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। এই সময় নিহত ব্যক্তির ভাই এসে বললো, 'আমি মাফ

www.nagorikpathagar.org

করে দিয়েছি।' কিন্তু তিনি তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে বললেন, 'ওরা বোধ হয় তোমাকে ভয় দেখিয়েছে।' সে বললো, "না, আমি রক্তপণ পেয়েছি এবং আমি বুঝতে পেরেছি যে, ওকে হত্যা করলে আমার ভাই ফিরে আসবে না।" তখন তিনি খুনিকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, "আমাদের অধীনস্থ অমুসলিম নাগরিকদের রক্ত আমাদের রক্তের মতোই এবং তাদের রক্তপণ আমাদের রক্তপণের মতোই" (বুরহান, ২য় খণ্ড)।
এ কারণেই ফকিহগণ এই বিধি প্রণয়ন করেছেন যে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী কোন নাগরিক কোনো মুসলমানের হাতে ভুলক্রমে নিহত হলে তাকেও অবিকল সেই রক্তপণ দিতে হবে, যা কোনো মুসলমানের নিহত হবার ক্ষেত্রে দিতে হয় (দুরুল মুখতার, ৩য় খণ্ড)।

০২. ফৌজদারি দণ্ডবিধি :

ফৌজদারি দণ্ডবিধি মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সকলের জন্য সমান। অপরাধের যে সাজা মুসলমানকে দেয়া হয়, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী নাগরিককেও তাই দেয়া হবে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জিনিস যদি মুসলমান চুরি করে, কিংবা মুসলমানের জিনিস যদি অন্যান্য ধর্মাবলম্বী চুরি করে, তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই চোরের হাত কেটে ফেলা হবে। কারো ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে অপবাদ আরোপকারী মুসলমানই হোক আর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীই হোক উভয়কেই একই শাস্তি দেয়া হবে। অনুরূপভাবে ব্যভিচারের শাস্তিও মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য একই রকম। তবে মদের বেলায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে (কিতাবুল খারাজ, পৃ. ২০৮, ২০৯; আল-মাব্‌সূত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৭-৫৮।)

০৩. দেওয়ানি আইন :

দেওয়ানি আইনেও মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সমান। "তাদের সম্পত্তি আমাদের সম্পত্তির মতো" হযরত আলী রাঃ এর এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, মুসলমানের সম্পত্তি যেভাবে হিফাযত করা হয় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সম্পত্তির হিফাযতও তদ্রূপ সাম্যের অনিবার্য দাবি অনুসারে দেওয়ানি আইনের আলোকে মুসলমানদের ওপর যেসব দায় দায়িত্ব অর্পিত হয় অমুসলিমের ওপরও তাই অর্পিত হবে।

ব্যবসায়ের যেসব পন্থা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ, তা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্যও নিষিদ্ধ। তবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা শুধুমাত্র শূকরের বেচাকেনা, খাওয়া এবং মদ বানানো, পান ও কেনাবেচা করতে পারবে (আল-মাসবুত, ১৩শ খণ্ড)।

www.nagorikpathagar.org

০৪. সম্মানের হিফাযত :

কোনো মুসলমানকে জিহবা বা হাত পা দিয়ে কষ্ট দেয়া, গালি দেয়া, মারপিট করা বা গিবত করা যেমন অবৈধ, তেমনি এসব কাজ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বেলায়ও অবৈধ।

"তাকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব এবং তার গিবত করা মুসলমানের গিবত করার মতোই হারাম" (দুররুল মুখতার : ৩য় খণ্ড)।

০৫. পারিবারিক বিষয়াদি :

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের পারিবারিক কর্মকাণ্ড তাদের নিজস্ব পারিবারিক আইন অনুসারে স্থির করা হবে। এক্ষেত্রে তাদের ওপর ইসলামী আইন কার্যকর হবে না। আমাদের ঘরোয়া জীবনে যেসব জিনিস অবৈধ, তা যদি তাদের ধর্মীয় ও জাতীয় আইনে বৈধ হয়, তাহলে ইসলামী আদালত তাদের আইন অনুসারেই ফয়সালা করবে। উদাহরণ স্বরূপ সাক্ষী ছাড়া বিয়ে, মোহ্‌র ছাড়া বিয়ে, ইদ্দতের মধ্যে পুনরায় বিয়ে অথবা ইসলামে যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ তাদের সাথে বিয়ে যদি তাদের আইনে বৈধ থেকে থাকে, তাহলে তাদের জন্য এসব কাজ বৈধ বলে মেনে নেয়া হবে।

তবে কোনো ক্ষেত্রে যদি বিবদমান উভয় পক্ষ স্বয়ং ইসলামী আদালতে আবেদন জানায় যে, ইসলামী শরিয়ত মুতাবিক তাদের বিবাদের ফায়সালা করা হোক, তবে আদালত তাদের ওপর শরিয়তের বিধান কার্যকর করবে। তাছাড়া পারিবারিক আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিবাদের যদি একপক্ষ মুসলমান হয়, তবে ইসলামী শরিয়ত মুতাবিক ফায়সালা হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন খ্রিষ্টান মহিলা কোনো মুসলমানের স্ত্রী ছিলো এবং তার স্বামী মারা গেলো। এমতাবস্থায় এই মহিলাকে শরিয়ত মুতাবিক স্বামীর মৃত্যুজনিত ইদ্দত পুরোপুরি পালন করতে হবে। ইদ্দতের ভেতরে সে বিয়ে করলে সে বিয়ে বাতিল হবে (আল-মাবসুত, ৫ম খণ্ড)।

০৬. ধর্মীয় অনুষ্ঠান :

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠানাদি প্রকাশ্যভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে উদযাপন করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান এই যে, অমুসলিমরা তাদের নিজস্ব জনপদে এটা অবাধে করতে পারবে। তবে পরিপূর্ণ ইসলামী জনপদগুলোতে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ইচ্ছা করলে তাদেরকে এ ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতাও দিতে পারবে, আবার কোনো ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করতে চাইলে তাও করতে পারবে।

www.nagorikpathagar.org

"যেসব জনপদ বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদ নয়, সেখানে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকে মদ ও শূকর বিক্রি, ক্রুশ বহন করা ও শঙ্খ ধ্বনি বাজানোতে বাধা দেয়া হবে না। চাই সেখানে মুসলিম অধিবাসীদের সংখ্যা যতোই বেশি হোক না কেনো। তবে বিধিবদ্ধ ইসলামী অঞ্চলে এসব কাজ পছন্দনীয় নয়। অর্থাৎ যেসব জনপদকে জুমুয়া, ঈদ ও ফৌজদারি দন্ডবিধি প্রচলনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তবে যে সমস্ত পাপ কাজকে তারাও নিষিদ্ধ মনে করে, যেমন ব্যভিচার ও অন্যান্য অশ্লীল কাজ, যা তাদের ধর্মেও নিষিদ্ধ সেসব কাজ করতে পারবে না। চাই সেটা মুসলমানদের জনপদে হোক কিংবা তাদের জনপদে হোক" (বাদায়ে, ৭ম খণ্ড)।

০৭. উপাসনালয়ের নিরাপত্তা :

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়ে সাধারণ অবস্থাতো দূরের কথা যুদ্ধাবস্থায়ও হামলা করা যাবে না। কোনো পুরোহিত বা পাদ্রির প্রতি অস্ত্র তাক করা যাবে না। কোনো উপাসনালয় জ্বালিয়ে দেয়া যাবে না। হাবিব ইবন অলীদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) তার সৈন্যদল প্রেরণকালে বলতেন,

"তোমরা আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে যাত্রা করো। তোমরা আল্লাহর প্রতি কুফরকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আমি তোমাদের কয়েকটি উপদেশ দিয়ে প্রেরণ করছি : (যুদ্ধক্ষেত্রে) তোমরা বাড়াবাড়ি করবে না, ভীরুতা দেখাবে না, (শত্রুপক্ষের) কারো চেহারা বিকৃতি ঘটাবে না, কোনো শিশুকে হত্যা করবে না, কোনো গির্জা (উপাসনালয়) জ্বালিয়ে দেবে না এবং কোনো বৃক্ষও উৎপাটন করবে না" (আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ : ৯৪৩০)।

এদিকে মু'তার যুদ্ধে রওনার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দেন :

"তোমরা কোনো নারীকে হত্যা করবে না, অসহায় কোনো শিশুকেও না; আর না অক্ষম বৃদ্ধকে। আর কোনো গাছ উপড়াবে না, কোনো খেজুর গাছ জ্বালিয়ে দেবে না। আর কোনো গৃহও ধ্বংস করবে না" (মুসলিম : ১৭৩১)।

আবু বকর (রা) একই পথে হাঁটেন। আপন খিলাফতকালে প্রথম যুদ্ধের বাহিনী প্রেরণ করতে গিয়ে তিনি এর সেনাপতি উসামা ইবন যায়েদ (রা) এর উদ্দেশে বলেন,

'হে লোক সকল, দাঁড়াও আমি তোমাদের দশটি বিষয়ে উপদেশ দেব। আমার পক্ষ হিসেবে কথাগুলো তোমরা মনে রাখবে। কোনো খেয়ানত করবে না, বাড়াবাড়ি করবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, (শত্রুদের) অনুরূপ করবে না, ছোট বাচ্চাকে হত্যা করবে না, বয়োবৃদ্ধকেও না আর নারীকেও না। খেজুর গাছ কাটবে না কিংবা তা জ্বালিয়েও দেবে না। কোনো ফলবতী গাছ কাটবে না। আহারের প্রয়োজন ছাড়া কোনো ছাগল, গরু বা উট জবাই করবে না। আর

www.nagorikpathagar.org

তোমরা এমন কিছু লোকের সামনে দিয়েও অতিক্রম করবে যারা নিজেদের গির্জাগুলোয় ছেড়ে দিয়েছে। তোমরাও তাদেরকে তাদের এবং তারা যা ছেড়ে দিয়েছে নিজেদের জন্য তা ছেড়ে দেবে (মুখতাসারুত তারিখি দিমাশক : ১/৫২; তারীখুত তাবারী)।

নির্ভেজাল মুসলিম জনপদ্গুলোতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের যেসব প্রাচীন উপাসনালয় থাকবে, তাতে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। উপাসনালয় যদি ভেংগে যায়, তবে একই জায়গায় পূনর্নির্মাণের অধিকারও তাদের আছে। তবে নতুন উপাসনালয় বানানোর অধিকার নেই (বাদায়ে, ৭ম খণ্ড)।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের যে সব সাধারণ অধিকার দেয়া হয়েছে :

উপরে আমরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের যে সব অধিকারের উল্লেখ করেছি, সেগুলো তাদের জন্য শরিয়তে সুনির্দিষ্ট এবং সেগুলো যে কোনো ইসলামী শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

এছাড়াও বর্তমান যুগে একটি ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র তার অন্যান্য ধর্মাবলম্বী নাগরিকদেরকে ইসলামী মূলনীতির আলোকে নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ দিতে পারেঃ

০১. বাকস্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা ইত্যাদি :

ইসলামী রাষ্ট্রে একজন মুসলমান যেমন বাকস্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা এবং মতামত ও বিবেকের স্বাধীনতা ভোগ করে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও সেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করবে। এ ব্যাপারে যেসব আইনগত বিধি নিষেধ মুসলমানদের ওপর থাকবে, তা তাদের উপরও থাকবে। আইন সঙ্গতভাবে তারা সরকার, সরকারি আমলা এবং স্বয়ং সরকার প্রধানেরও সমালোচনা করতে পারবে। তারা নিজেদের ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং একজন অন্য ধর্মাবলম্বী যে কোনো ধর্ম গ্রহণ করলে তাতে সরকারের কোন আপত্তি থাকবে না। তবে কোনো মুসলমান ইসলামী রাষ্ট্রের চৌহদ্দিতে থাকা অবস্থায় আপন ধর্ম পরিবর্তন করতে পারবে না। তবে এরূপ ধর্মত্যাগী মুসলমানকে আপন ধর্ম ত্যাগের ব্যাপারে যে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে, সেটা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্য ধর্মাবলম্বী যে ব্যক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে ইসলাম ত্যাগ করেছে, তাকে এজন্য আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে না।

০২. শিক্ষা :

ইসলামী রাষ্ট্র গোটা দেশের যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করবে, তাদেরকে সেই শিক্ষাব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ইসলামের ধর্মীয় পুস্তকাদি পড়তে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না। দেশের সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অথবা নিজেদের

www.nagorikpathagar.org

বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আপন ধর্ম শিক্ষার আলাদা ব্যবস্থা করার পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের থাকবে।

০৩. চাকরি :

কতিপয় সংরক্ষিত পদ ছাড়া সকল চাকরিতে তাদের প্রবেশাধিকার থাকবে এবং এ ব্যাপারে তাদের সাথে কোনো বৈষম্য করা চলবে না। মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের যোগ্যতার একই মাপকাঠি হবে এবং যোগ্য লোকদেরকে ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে নির্বাচন করা হবে।

সংরক্ষিত পদসমূহ বলতে ইসলামের আদর্শগত ব্যবস্থায় মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন পদসমূহকে বুঝানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের একটি দলের যথেষ্ট চিন্তা ভাবনার পর এই পদগুলোর তালিকা তৈরি করা যেতে পারে। যেসব পদ নীতি নির্ধারণ ও বিভিন্ন দিক নির্দেশনার সাথে জড়িত, সেগুলো মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন পদ। একটা আদর্শবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় এইসব পদ কেবল সংশ্লিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসীদেরকেই দেয়া যেতে পারে। এই পদগুলো বাদ দেয়ার পর বাদবাকি সমগ্র প্রশাসনের বড় বড় পদেও যোগ্যতা সাপেক্ষে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকে নিয়োগ করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, রাষ্ট্রের মহা হিসাব রক্ষক, মহা প্রকৌশলী কিংবা পোস্ট মাস্টার জেনারেলের ন্যায় পদে সুযোগ্য অমুসলিম ব্যক্তিদের নিয়োগে কোনো বাধা নেই।

০৪. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও পেশা :

শিল্প, কারিগরি, বাণিজ্য, কৃষি ও অন্য সকল পেশার দুয়ার অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এ সব ক্ষেত্রে মুসলমানরা যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে, তা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও ভোগ করবে এবং মুসলমানদের ওপর আরোপ করা হয় না এমন কোনো বিধি নিষেধ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ওপরও আরোপ করা যাবে না। মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের অর্থনৈতিক ময়দানে তৎপরতা চালানোর সমান অধিকার থাকবে।

০৫. অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তার একমাত্র উপায় :

একটি ইসলামী রাষ্ট্র তার অন্যান্য ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের যে অধিকার দেয়, তা পার্শ্ববর্তী কোন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্র তার মুসলিম নাগরিকদেরকে কী কী অধিকার দিয়ে থাকে, বা আদৌ দেয় কি? না, তার উপর নির্ভর করবে না। আমরা মুসলমানরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের দেখাদেখি আপন কর্মপন্থা নির্ণয় করব তা নয়। তারা ইনসাফ করলে এরাও ইনসাফ করবে আর তারা যুলুম করলে এরাও যুলুম করবে, এটা হতে পারে না। আমরা মুসলমান হিসেবে একটা সুস্পষ্ট

www.nagorikpathagar.org

ও সুনির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শের অনুসারী। তাই একটি ইসলামী রাষ্ট্রকে নিজস্ব নীতি ও আদর্শ অনুসারেই কাজ করতে হয়। ইসলাম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের যে সকল অধিকার দেয় তা কেবল কগজে কলমে নয় বরং পূর্ণ আন্তরিকতা ও সদুদ্দেশ্য নিয়েই দেয়। যে দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করবো তা পূর্ণ ইনসাফ ও সততার সাথে পালন করবো।
এরপর একথা আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির সবচেয়ে বড় যে নিশ্চয়তা দেয় তা এই রাষ্ট্রগুলোকে পরিপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তারিত করা ছাড়া আর কোনোভাবে দেয়া সম্ভব নয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ইসলামের শান্তিপূর্ণ ও উদারনৈতিক শিক্ষার সৌজন্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পরমতসহিষ্ণুতার জন্য বরাবর সারা বিশ্বের সুনাম কুড়িয়েছে। এ দেশের মুসলিম নাগরিকরা সবসময় তাদের ধর্মের শিক্ষানুযায়ী অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। এ দেশে মসজিদ-মন্দিরে পাশাপাশি স্ব-স্ব ধর্মের ইবাদত হয়। পবিত্র মাহে রমজানে হিন্দুরা সাড়ম্বরে জন্মাষ্টমী পালন করে। খ্রিস্টানরা জাঁকজমকভাবে বড়দিন উদযাপন করেন। বৌদ্ধ ও অন্য ধর্মাবলম্বীরাও নিজ নিজ ধর্মীয় উৎসব নির্বিবাদে পালন করেন।

ইসলাম অন্যান্য ধর্মাবলম্বী কোন ব্যক্তিকে তার ধর্মীয় কারণে যে কোন প্রকার হয়রানি করার পক্ষে নয় তার প্রমাণ উপরের আলোচনায় পরিষ্কার হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম অধ্যুষিত দেশেই এ কথার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশও তার অন্যতম মডেল হওয়ার দাবি করতে পারে। স্বাধীনতার পর থেকে এ দেশে মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিক আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রেখে বসবাস করছে তার পিছনে ইসলামের উদার ও শান্তিকামী নীতির যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ইসলামের আহবান

ইসলাম কোন বিশেষ জাতি, গোষ্ঠী বা গোত্রের জন্য আবির্ভূত হয়নি। ইসলাম আল্লাহর পক্ষ হতে সকল মানুষের প্রতি ন্যায়-নিষ্ঠার আহবান। শুধুমাত্র মুসলিম গৃহে জন্মগ্রহণ করলেই মুসলিম হওয়া যায়না। ইসলাম এক নিরঙ্কুশ বিশ্বাসের নাম। আল্লাহর দাসত্বে নিজেদের বিলিয়ে দেয়ার নাম। ইসলাম হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত ঈশ্বরকে অস্বীকার করে মহান আল্লাহর একত্ব ও একক শক্তিমত্তা, একক অনুগ্রহ, একক দয়ায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার নাম।

ইসলাম মানে শান্তি। সকল মানুষকে শান্তির আহবান। অন্যায়ের মোকাবেলা করে শান্তির প্রতিষ্ঠা। আত্মার প্রশান্তি লাভ, পার্থিব শান্তি অর্জন। সর্বোপরি আখিরাতের মহান শান্তির অপেক্ষায় নিজেকে যথাযথ প্রস্তুত করার নাম।
ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ। নিজের যত অতৃপ্তি, অবিশ্বাস, অপ্রাপ্তি, দুর্দশা, অহংকার- সবকিছু নিয়ে এক মহান মালিকের কাছে আত্মসমর্পণ করা। যার কাছে আত্মসমর্পণে কোন লজ্জা নেই। যার সমকক্ষ কেউ নেই। যার মধ্যে দৃশ্যমানতার বিভ্রান্তি নেই। যার কাছে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত জঞ্জালকে মোকাবেলার শক্তি অর্জন করা যায়।

ইসলাম মানে নিরাপত্তা। পৃথিবীর সমস্ত অন্যায় থেকে নিরাপত্তা। আখিরাতের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, জাহান্নামের ভয়ঙ্কর শাস্তি থেকে নিরাপত্তা। পৃথিবীতে সমস্ত পরাজয়, হতাশা থেকে নিরাপত্তা। একজন সত্যিকারের মুসলিম কখনো নিরাপত্তাহীন হয় না, কারণ সে জানে পৃথিবীতে নিরাপত্তাহীনতাও তার পরীক্ষা, আর পরকালের নিরাপত্তাই চূড়ান্ত নিরাপত্তা।
ইসলাম তা নয়, যা মুসলিমরা করে বরং ইসলাম তা-ই, যা মুসলিমদের করা উচিত। ইসলাম গ্রহণ মানে মানুষের সহজাত খারাপ প্রবৃত্তিকে ভালো কাজ দিয়ে জয় করা। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে সমস্ত কাজের ব্যাপারেও সতর্ক থাকা, কারণ সীমিত শক্তির মানুষকে ফাঁকি দেয়া গেলেও মহাশক্তিধর আল্লাহকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়।

ইসলাম নিজেকে মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম বলে দাবি করে। মানুষের নিকট ইসলামের বিভিন্ন আহবান রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে আছে–

www.nagorikpathagar.org

সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা :
ইসলাম মানুষকে এই সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার আহবান জানায়। এই বিশাল পৃথিবী সম্পর্কে, যাকে আল্লাহ তা'আলা নিখুঁতভাবে তৈরি করেছেন। এই বিশাল আসমান সম্পর্কে, যাকে কোন খুঁটি ছাড়াই জাগিয়ে রাখা হয়েছে, পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে, যাকে জমিনের পেরেক করে দেয়া হয়েছে, নিরন্তর আলোদায়ী সূর্য্য সম্পর্কে। এই সবকিছুর ব্যাপারে চিন্তাভাবনা মানুষকে এক আল্লাহর সম্পর্কে ধারণা দেয়।

পবিত্র কুরআনে হযরত ইবরাহিম (আ) এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে - "স্মরণ কর, যখন ইবরাহিম (আ) পিতা আযরকে বললেন, তুমি কি প্রতিমাসমূহকে উপাস্য মনে কর? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট। আর আমি এভাবেই ইব্রাহিমকে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়। অনন্তর যখন রাত্রির অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হলো, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল, বলল : ইহা আমার প্রতিপালক। অতঃপর তা যখন অস্তমিত হল, তখন বলল- আমি অস্তগামীদের ভলোবাসিনা। অতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখল, বলল- এটি আমার প্রতিপালক। অনন্তর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন বলল- যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

অতঃপর যখন সূর্যকে চকচক করতে দেখল, বলল- এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল- হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যেসব বিষয়ে অংশীদার সাব্যস্ত কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত।
আমি একমুখী হয়ে স্বীয় মুখ ঐ সত্তার দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরেক নই।

তাঁর সাথে তার সম্প্রদায় বিতর্ক করল। সে বলল- তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে বিতর্ক করছ? অথচ তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। তোমরা যাদেরকে শরিক কর, আমি তাদের ভয় করি না তবে আমার পালনকর্তাই যদি কোন কষ্ট দিতে চান। আমার পালনকর্তাই প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। তোমরা চিন্তা করনা?"
(সূরা আনআম :৭৪-৭৫)।

www.nagorikpathagar.org

কুরআন অধ্যয়নের আহ্বান :

কুরআন মহান আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের নিকট এক চিরস্থায়ী আহ্বান। মানুষের মনে জাগ্রত প্রশ্নগুলোর উত্তর মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে প্রদান করেছেন।

কুরআনের শুরুতেই আল্লাহ্র ঘোষণা–

"এটা এমন কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই" (সূরা বাকারা : ০২)।

মুহাম্মদ (সা) এর সময়ে হাজার হাজার মানুষ এই পবিত্র কুরআনের বাণী অনুধাবন করেই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কুরআনের সংস্পর্শে আসলে মানুষের পক্ষে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া সহজ হয়ে যায়। কুরআন মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষকে সত্যের সন্ধান দেয়।

এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন :

ইসলামের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি আহ্বান হচ্ছে– একক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে বলেছেন–

"আর যদি আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ'র অস্তিত্ব থাকত, তবে সবকিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যেত" (সূরা আল আম্বিয়া : ২২)।

এছাড়াও বলেছেন– "সাবধান! সৃষ্টি যার, নির্দেশও চলবে তার" (সূরা আল আ'রাফ : ৫৪)।

সুতরাং মহান আল্লাহ্র এই একত্বের প্রতি, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে একমাত্র ইলাহ (উপাস্য) হিসেবে, একমাত্র প্রতিপালক হিসেবে এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সমস্ত গুণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ইসলামের একেবারে মৌলিক ও একান্ত দাবি।

আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমে মানুষ তাঁর কর্ম ও চিন্তায় যে সব অন্যান্য উপাস্য বাস করে সবাইকে বিদায় জানায়। একজন মানুষ যখন এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তখনই সে সবচেয়ে বেশি বিনয়ী হয়, সবচেয়ে বেশি সাহসী হয় এবং তার সব কাজের প্রতি আল্লাহ্র ক্ষমতা জানার মধ্য দিয়ে প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সমস্ত ধরনের গুণাহ্ হতে মুক্তি লাভ করে ও বিরত থাকে।

ইসলামে সবকিছুর মূলে হচ্ছে এই একত্ববাদ। মানুষের উপাসনায়, কর্মে, সভ্যতা ও ইতিহাস বিনির্মাণে সবকিছুতে ঈমানের এই মৌলিক আহ্বান 'আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস' অপরিহার্য।

www.nagorikpathagar.org

তাই, মানুষের প্রতি ইসলামের প্রথম কার্যকর আহবান হচ্ছে-এক অদ্বিতীয় নিরঙ্কুশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

শিরক থেকে দূরে থাকা :

শিরক হচ্ছে মহান আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার বানানো। ইবাদত বা দাসত্বের ক্ষেত্রে, প্রতিপালক হিসেবে কাউকে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে এবং আল্লাহর গুণসমূহ অন্য কোন কিছুর সাথে প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে আল্লাাহ ব্যতীত অন্য কাউকে স্বীকার করাই শিরক। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুলুম" (সূরা লুকমান : ১৩)।

মহান আল্লাহ মানুষের অন্যান্য গুণাহ মাফ করলেও চূড়ান্ত তাওবা (অনুতপ্ত হয়ে ভালো পথে ফিরে আসা) ব্যতীত কারো শিরকের গুণাহ মাফ করবেন না।
শিরক মানুষকে অন্য মানুষের থেকে নিজেকে বড় মনে করতে শেখায়। শিরক-ই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষের জুলুমের হাতিয়ার হয়ে থাকে।
তাই মানুষের প্রতি ইসলামের আহবান হচ্ছে, সর্বাবস্থায় সকল ধরণের শিরকমুক্ত থাকা। ঈমান আনয়ন ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথেই শিরকমুক্তির ঘোষণা দেয়াও জরুরি।

পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করা :

মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস বলতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন–
"নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করতে চাই। তারা (ফেরেশতা) বলল– আপনি কি এমন কাউকে তৈরি করবেন, যারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা করবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসা করি ও পবিত্রতা বর্ণনা করি। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না" (সূরা-বাক্বারাহ : ৩০)।

অন্য জায়গায় আল্লাহ বলেছেন– "নিশ্চয়ই আমি মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার দাসত্ব করার জন্য" (সূরা যারিয়াত : ৫৬)।

এই পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষকে প্রেরণ করেছেন তার প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব দিয়ে। মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন ও আনুগত্য করা এবং সমস্ত মানুষকে এই আনুগত্যের পথে আহবান করা আর মহান আল্লাহ যে বিধি-বিধান দিয়েছেন, সেগুলো বাস্তবায়ন করা।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর আনুগত্য :

আল্লাহ বলেছেন- "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো" (সূরা আন-নিসা : ৫৯)।

অপর জায়গায় মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন-" যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম পালন করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তার নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকে তারাই সফলকাম" (সূরা নুর : ৫২)।

শুধুমাত্র বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমেই মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়। তাই বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে মানুষের প্রতি ইসলামের আহবান হচ্ছে, মহান আল্লাহর আনুগত্য করা তথা তাঁর আদেশ নিষেদ মেনে চলা।

মুহাম্মদ (সা) ও অন্যান্য নবীদের প্রতি ঈমান আনয়ন :

হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বশেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পরে সবচেয়ে মৌলিক দাবি। সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী মুহাম্মদ (সা) হলেন ইসলামের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। আরবের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়ে মুহাম্মদ (সা) আরবের মানুষদেরকে সোনার মানুষে পরিণত করেছিলেন। এক বিশাল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যিনি মানুষের কাছে ঈমানের দাবি পৌছে দিয়েছিলেন, একেবারে শূন্য থেকে শুরু করে যিনি লক্ষ লক্ষ মানুষকে তার আদর্শ, চরিত্র ও কর্মপন্থার দ্বারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে এসেছিলেন। এই মহামানব সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া কারো পক্ষে মুসলিম বা মু'মিন হওয়া অসম্ভব। হযরত মুহাম্মদ (সা) ছাড়াও হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ), হযরত মুসা (আ) থেকে হযরত ইবরাহিমসহ (আ) অন্যান্য সকল নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও ইসলামের অন্যতম মৌলিক আহবান।

আখিরাত ও অন্যান্য মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন :

আখিরাতের প্রত্যেকটি স্তরসহ ঈমানের অন্যান্য যেসব মৌলিক দাবি রয়েছে যেমন : কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও ভাগ্যের ভালো- মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইসলামের অন্যতম মৌলিক আহবান।

শয়তানের প্রতারণা থেকে দূরে থাকা :

শয়তান হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিশাপ প্রাপ্ত। শয়তানের রয়েছে মানুষকে ধোঁকা দেয়ার শক্তি। শয়তান মানুষের প্রতি আল্লাহর সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।

www.nagorikpathagar.org

শয়তানের প্ররোচনার কারণেই মানুষ নিজেকে আল্লাহর পথে নিয়ে আসতে পারে না। বিভিন্ন উপায়ে মানুষকে আল্লাহর কাছে আসতে শয়তান বাধা দেয়।

শয়তান মানুষের ডান-বাম, সামনে- পেছনে, উপরে- নিচে সবজায়গায় ধোঁকা দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। তাই ইসলামের আহবান হচ্ছে- এই অভিশপ্ত শয়তানকে পরাজিত করে নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে প্রবেশ করানো। কিয়ামতের দিনে শয়তানের কাজ নিয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে

আর যখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, "সত্যি বলতে কি আল্লাহ্ তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করে ছিলেন তা সব সত্যি ছিল এবং আমি যেসব ওয়াদা করেছিলাম তার মধ্য থেকে একটিও পুরা করিনি"
(সূরা ইবরাহিম : ২২)।

শয়তান মানুষকে বিভিন্ন ভাবে ধোঁকার মধ্যে ফেলে দিয়ে মানুষের মাধ্যমে অসৎ কাজ করায়। তাই, মানুষের প্রতি ইসলামের আহবান হচ্ছে, শয়তানের পরিবর্তে নবীদেরকে নিজেদের আদর্শ বানিয়ে সমস্ত অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকা। এগুলো ছাড়াও ইসলাম মানুষকে যেসব কাজের দিকে আহবান করে তা হচ্ছে-

- ইবাদত করা
- বিনয়
- সততা ও স্বচ্ছতা
- ক্ষমাশীলতা
- ধৈর্য
- সদাচরণ করা
- অন্যায় আচরণ না করা
- কারো দোষ চর্চা না করা
- অপবাদ না দেয়া
- অযথা কারো পছনে গোয়েন্দাগিরি না করা
- ধোঁকা না দেয়া
- ঋণ পরিশোধ করা
- ওয়াদা রক্ষা করা
- দানশীলতা
- দায়িত্ববোধ
- শিক্ষাগ্রহণ করা

www.nagorikpathagar.org

- পরিবারের দায়িত্ব পালন
- শৃঙ্খলা
- জীবের প্রতি দয়া করা

প্রত্যেকটি পদক্ষেপে সর্বোত্তম, সবচেয়ে সুন্দর ও বিবেকপ্রসূত কাজ করাই হচ্ছে মানুষের নিকট ইসলামের আহ্বান।

সর্বোপরি, মানুষের প্রতি ইসলমের আহ্বান হচ্ছে ইসলামে পদার্পণ করা। কেননা, ঈমান আনয়ন ব্যতীত পরকালীন সফলতা সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-
"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত জীবনব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম"
(সূরা আলে ইমরান : ১৯)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন
"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবনব্যবস্থা মান্য করল, তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না" (সূরা আলে ইমরান : ৮৫)।

ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয় বরং ইহা একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান (Islam is not only a religon rather it is a complate code of life)। এটি একটি কালজয়ী মতাদর্শ। ইসলাম মানুষের বস্তুগত জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। জীবনাদর্শ, জীবনব্যবস্থা ও জীবনবিধান হিসেবে ইসলামে রয়েছে সব সমস্যার সঠিক সমাধান।

www.nagorikpathagar.org